প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৬০

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শ্রীদিলীপকুমার দে
দে প্রিণ্টার্স
১৫৭বি, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রীপ্রদীপ মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

ভূমিকা

এমারজেন্সী যেদিন ঘোষিত হয় সেদিন আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে অমন কিছু ঘটতে পারে বা ঘটেছে। মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি এমন কী উপায় আছে যাতে ২৯শে জুন তারিখের পরিকল্পিত আন্দোলন রক্তপাতে পর্যবসিত না হয়। জানালার ওপারে পথ দিয়ে কারা সব বলাবলি করতে করতে যাচ্ছিলেন, "কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জেনে আমাদের কী লাভ? আমাদের রেশন তো আমরা ঠিকমতো পাব।" বুঝতে পারিনে গ্রেপ্তারের কথা ওঠে কেন। হঠাৎ প্রদীপ মুখোপাধ্যায় এসে উত্তেজিত হয়ে বলেন, "খবরটা শুনেছেন? এমারজেন্সী জারি হয়েছে। জয়প্রকাশ, মোরারজী ও আরো অনেকে গ্রেপ্তার।" আমি তো স্তম্ভিত। চারদিন আগে থেকেই ওস্তাদের মার! প্রদীপবাবু আমার সন্দেহভঞ্জনের জন্যে আবার বেরিয়ে যান। বহু চেষ্টায় একখানা 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। স্বচক্ষেই দেখি দিল্লীর খবর। কিন্তু ওইপর্যন্ত। তার পর থেকেই সর্বব্যাপী নিষ্প্রদীপ অর্থাৎ সেনসরশিপ। পরের দিনের কাগজে একটি কি দুটি নাম পাওয়া গেল, আর সব অবলুপ্ত।

আর সেই সেনসরশিপ কেবল খবরের উপর দিয়েই বা রাজনীতির উপর দিয়েই গেল না। আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেকটি রচনা সেনসর করা হয়। ত্রৈমাসিক পত্রিকাও সেনসরের দফতরে পাশ না করালে নয়। পাছে তাতে আপত্তিকর বিষয় থাকে। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পত্রিকাও বাদ যায় না। এসব দেখে শুনে আন্তর্জাতিক পি ই এন সংস্থার ভারতীয় কেন্দ্র থেকে আমরা রাষ্ট্রপতির সকাশে প্রতিবাদপত্র পাঠাই। ফলে সেনসরশিপ কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল হয়। তার আগে আমার নিজের রচনার উপর লেখনীক্ষেপ ঘটে। একটি প্রবন্ধ তো মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করতেই দেন না। প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পেশ

করেন। তিনি আমাকে স্বয়ং পত্রযোগে নিষেধ করেন। লেখাটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নিধন সম্পর্কে। ন'মাস অপেক্ষা করেও যখন পুনর্বিবেচনার জন্যে আবেদনের উত্তর পাইনে তখন নিজের দায়িত্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশ করি। বই ব্যান করা হতে পারত, কিন্তু ততদিনে আমার বক্তব্য বাংলাদেশে পৌঁছে যেত।

যতদিন পর্যন্ত লড়াইটা ছিল বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সরকারীপক্ষের ততদিন পর্যন্ত আমি নিরপেক্ষ থেকেছি। কিন্তু সংবিধান সংশোধন করে এমারজেন্সীকে চিরস্থায়ী করতে গেলে যেটা হয় সেটা কেবল বিরোধীপক্ষকে নয় সাধারণ নাগরিককেও জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করা। অথচ তার সঙ্গে এমন কোনো অঙ্গীকার ছিল না যে রাষ্ট্র তার প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্মসংস্থান তথা অন্নসংস্থানের জন্যে দায়ী থাকবে। তখন আমরা কয়েকজন মিলে ভারতসভা হলে পুলিশ কমিশনারের অনুমতি নিয়ে সভা করি। সভায় অপ্রত্যাশিত ভিড় হয়। সভাপতি হন বলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন চীফ জাস্টিস শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। সংবিধান সংশোধন বিলের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন সভাপতি স্বয়ং। তথা বিশিষ্ট অ্যাডভোকেট শ্রীঅরুণকুমার দত্ত ও অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী ও আমিও দু'চার কথা বলি। এর পরে আমরা প্রাক্তন চীফ জাস্টিস শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তীর ভবনে মিলিত হয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করি। প্রস্তাবটি এই যে বিলটির বিশদ বিবেচনার জন্যে সময় দেওয়া হোক, ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক। প্রস্তাবটির প্রতিলিপি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সমীপে প্রেরিত হয়। সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত লিপি। উত্তর তো তিনি দিলেনই না, দুম করে বিলটিকে পাশ করিয়ে নিলেন।

আমরা কেউ তাঁর শত্রু নই। আমি তো বরাবর তাঁর পিতার ভক্ত ও তাঁর প্রতি সস্নেহ। কী কুক্ষণেই না তিনি এমারজেন্সী ঘোষণা করেছিলেন : তাও আমরা সহ্য করেছি, কারণ বিরোধীপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাইনি। কিন্তু দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানকে চক্ষের নিমেষে সমাজতান্ত্রিক বিশেষণের আবরণে ঢেকে অগণতান্ত্রিক সংবিধানে রূপান্তরিত করা যে সাধারণের স্বার্থবিরোধী। আমাকে মৌনভঙ্গ করতেই হলো। কিন্তু আমার প্রবন্ধ ছাপবে কে? সবাই যে সেনসরের ভয়ে আড়ষ্ট। আমার মুখরক্ষা করেন 'আলেখ্য' সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল ও 'দর্পণ' সম্পাদক শ্রীহীরেন

বস্তু। কংগ্রেস ইকনমিক বুলেটিনেও একটি ইংরেজী লেখা ছাপা হয়। শ্রীপ্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় তার বাংলা তর্জমা করেন, ছাপে 'দর্পণ'। এই কয়েকজন সাহসী সম্পাদক বাঙালীর মানরক্ষা করেছেন। আজ যাঁরা মুখর কাল তাঁরা ছিলেন নীরব। এই মুখরতা এসেছে সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল দেখে। ফলাফল তো নয়, প্রতিফল। দেশের লোকের মৌল অধিকার কেড়ে নিলে দেশের লোক ভোটে হারিয়ে দেয়। সাধারণ নাগরিক যে এতদূর স্বাধিকারসচেতন হয়েছে এটা কেই বা এর আগে জানত? দেশের স্বাধীনতার মতো এটাও একটা স্মরণীয় যুগান্তর। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের দিকে চেয়ে তাই বা কেমন করে বলি?

দক্ষিণের সাফল্য থেকে লোকের অনুমান যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার আসবেন, আবার কড়া হাতে শাসন করবেন। বেশ তো, আসুন না, কিন্তু শাসনটা আইনের শাসন হওয়া চাই। ইংরেজিতে যাকে বলে রুল অব ল। কড়া হাতের শাসনের সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল পরিচিত, ইংরেজ আমলে তার সঙ্গে আমিও জড়িত ছিলুম। কিন্তু ইংরেজরা রুল অব ল মেনে চলত, না মানলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠত। বড়লাটকে সংযত করার জন্যে ছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া, তাঁকে সংযত করার জন্যে পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের সদস্যগণ। 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' প্রভৃতি লিবারল পত্রিকা। 'নিউ স্টেটসম্যান' প্রভৃতি বামপন্থী পত্রিকা। 'টাইমস' প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী পত্রিকাও সব কিছু সমর্থন করত না। কিন্তু ইন্দিরাচালিত কংগ্রেস একেবারে নিরঙ্কুশ। যারাই সমালোচনা করেছে তারাই সেনসরের কোপে পড়েছে। তাদেরই বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়েছে। তাদের সাংবাদিক কর্মীদের কারো কারো বিনা বিচারে কারাবাস ঘটেছে। শক্ত শাসন আর অপশাসন দুই এক নয়। এ জ্ঞান যদি ইন্দিরাচালিত কংগ্রেসের হয়ে থাকে তো গণতন্ত্র নিশ্চয়ই তাঁদের আত্ম-সংশোধনের সুযোগ দেবে। আমরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চাই, তার মানে পালা করে দুই দলের শাসন। একটিমাত্র দল ফী বারেই জিতবে, এটা তাদের ঐতিহ্য নয় যাদের কাছ থেকে আমরা এ খেলা শিখেছি। ইন্দিরা কংগ্রেস যে ফিরতে পারে এ সম্ভাবনা জনতা পার্টিকেও সাবধান করবে। নয়তো সে অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল ও চৌচির হবে।

কোনো ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের বিরুদ্ধে আমার প্রেজুডিস নেই। কমিউনিস্টদেরও আমি গণতন্ত্রের পরীক্ষায় নামতে দেখলে খুশি হই। রুল অব ল মানতে দেখলে আনন্দিত হই। শক্ত শাসন যদি অপশাসন না হয় তবে

তারও তো দরকার আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে দেশে যদি জজ বলে কেউ থাকেন তবে তাঁর বিচারের স্বাধীনতা থাকা চাই, বিচারপ্রার্থীদের তাঁর কাছে যাবার অধিকার থাকা চাই, তাঁর আদেশ অভ্রান্ত না হলেও মান্য হওয়া চাই। দেশে যদি সাংবাদিক বা লেখক বলে কেউ থাকেন তবে তাঁর মাথার উপরে খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। তাঁর কুযুক্তি খণ্ডন করতে হবে সুযুক্তি দিয়ে। অসত্য খণ্ডন করতে হবে সত্য দিয়ে। নিরঙ্কুশ কবিরা যুগে যুগে রসিকদের হাড় জ্বালিয়েছে, তা বলে তাদের কণ্ঠরোধ করলে তো কবিতাই রুদ্ধস্রোত হবে।

এই প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগই এমারজেন্সীর সময় লেখা। কখনো যদি তার পুনরাবৃত্তি হয় তার আগেই এগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এইভাবে জনমত তৈরি হলে পুনরাবৃত্তি নিরোধও সম্ভবপর।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যিকের সঙ্কট

লেখকের স্বাধীনতা আমার কাছে একটা বিলাসিতা নয়, একটা আরামের জিনিস নয়, একটা প্রাণসম্পর্কিত প্রয়োজন। একটা ভাইটাল নেসেসিটি। যে লেখা স্বাধীনভাবে লিখিত নয় সে লেখায় আর সব কিছু থাকতে পারে, কিন্তু মানুষটি নেই। অমন একটা নৈর্ব্যক্তিক রচনা যন্ত্রের দ্বারাও লিখিত হতে পারে। কম্‌পিউটারকেও একদিন সেকাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু সে রকম লেখা কখনো সাহিত্য বলে গণ্য হবে না। যে দেশের লোক সাহিত্য ভালোবাসে সে দেশের লোক সাহিত্যিককে স্বাধীনতা দিতেও ভালোবাসে, নয়তো নিজেরাই বঞ্চিত হয়।

অবশ্য স্বাধীনতামাত্রেরই অপব্যবহার হয়ে থাকে। সব দেশে ও সব যুগে কতক লেখক স্বাধীনতার অপব্যবহার করে চারদিক থেকে অঙ্কুশ ডেকে আনে। কিন্তু কতক লেখকের দায়িত্বহীনতার জন্যে যদি সব লেখকের স্বাধীনতার উপর অঙ্কুশ প্রয়োগ করা হয় তবে দেশের সাহিত্য হয় নিতান্ত একটা ফরমাশী ব্যাপার। মধ্যযুগে তার চরম হয়েছিল। রেনেসাঁস এসে লেখককে শিল্পীকে মুক্তি দিল। তা না হলে কবিরা হতেন রাজার বা পোপের সভাকবি। শিল্পীরা হতেন রাজার বা পোপের সভাশিল্পী।

একালে আবার এক নতুন দাবী উঠেছে। কবিকে আবার সভাকবি হতে হবে—জনতার বা জনতার যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের। এ দাবী মেনে নিলে নতুন এক মধ্যযুগের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। যে যুগে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক ও টেকনোলজিকাল প্রগতি ঘটবে, সেই সঙ্গে ভূতপূর্ব সাহিত্যিক তথা সাংস্কৃতিক দুর্গতি। প্রগতি ও দুর্গতির এককালীন সহ-অবস্থান ধীরে ধীরে লোকের গা-সওয়া হয়ে যাবে। কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করবে না কেন

আর টলস্টয়, ডসটয়েভস্কি, টুর্গেনেভ, চেকভ, গর্কি জন্মান না। এখন তো দুধ আর মধুতে দেশ ভেসে যাচ্ছে। জন্মালে ক্ষীর সর ননী মাখনের তো অভাব হতো না।

এর উত্তর, লেখকেরা যা খেয়ে বাঁচে তা আর পাঁচজন মানুষের মতো ভাত রুটি, কিন্তু শুধু তাই নয়। ওদের খোরাকের তালিকায় পড়ে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কল্পনা, স্বাধীন অনুভূতি, স্বাধীন ভাবপ্রকাশ। অপব্যবহার হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারো, কিন্তু পাছে অপব্যবহার হয় তার জন্যে ব্যবহার মাত্রই নিরোধ করতে পারো না। অপব্যবহার যারা করে তাদের ক্ষমতা সরস্বতী স্বয়ং কেড়ে নেন। তেমনি অব্যবহার করলেও ক্ষমতা চলে যায়। এটাও সরস্বতীর নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মও তাই। পায়ের ব্যবহার না করলে পায়ের জোর থাকে না। হাতের ব্যবহার না করলে হাত ঠুঁটো হয়ে যায়। যেমন উর্ধ্ববাহুর। দিনরাত শুয়ে থাকলে শরীর অসাড় হয়ে যায়। দেহের মতো মনেরও চালনা চাই। নইলে মন হয়ে যায় অচল। দেশটাও হয়ে যায় অচলায়তন।

অপব্যবহার একদিকে। অব্যবহার আরেকদিকে। দুটোই লেখকের পক্ষে খারাপ। মাঝখানে লেখনীর সদ্ব্যবহার। এ না হলে সাহিত্যের সৃষ্টি বা বিকাশ হয় না। একই কথা শিল্পের বেলাও খাটে। সদ্ব্যবহারের স্বাধীনতা প্রত্যেক লেখকের মৌল অধিকার। বলা যেতে পারে জন্মস্বত্ব। এতে হস্তক্ষেপ করতে হলে একশোবার ভাবতে হয়। চোখ বুজে কোনো একটা ফরমূলা অনুসারে কাটছাঁট করলে যাঁর উপর অন্যায় করা হয় তিনি সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁর উপর অন্যায় করলে তিনি বরদা হবেন না। বৃথা হবে আনুষ্ঠানিক সরস্বতী পূজা। সরস্বতীবর্জিত দেশ হবে সাহিত্যবর্জিত। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। অজস্র পুস্তক ও পত্রিকা বেরোবে, রোজগারও মন্দ হবে না, তবু সাহিত্যের মান নেমে যাবে, নেমে যাবে সাহিত্যিকেরও মান। রাষ্ট্রের বংশবদ সাহিত্যিক আর রাষ্ট্রের আজ্ঞাবহ সিপাই একসারিতে বসবে। সিপাইকে অবজ্ঞা করতে চাইনে, সে যা করে তা কি কম দরকারী? তবু সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তার প্রতিভূ আজ্ঞাবহ সিপাই নয়, তা স্বাধীনসম্পন্ন মুনি ঋষি, কবি মনীষী, রূপকার, যাঁরা না থাকলে সভ্যতা বা সংস্কৃতি বলতে বিশেষ কিছু থাকে না।

মানুষমাত্রেরই চাই মনুষ্যমর্যাদা, হিউমান ডিগনিটি। কিন্তু তার জন্যে

সংগ্রাম করতে এগিয়ে আসেন প্রধানত দেশের সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সারস্বতগণ। এঁরাও একটা আর্মি, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ নন, অপরের দ্বারা পরিচালিত নন। দেশে যে মনুষ্যমর্যাদার জন্যে সংগ্রাম নেই, সংগ্রামকারী নেই, ঐতিহ্য নেই সে দেশের মানুষ সুখে থাকতে পারে, স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের হিউমান ডিগনিটি থাকে না। তারা ভুলেই যায় যে মনুষ্য-মর্যাদাই সর্বোত্তম মূল্য। গাড়ী, বাড়ী, নারী, সম্পত্তি ও সম্পদ নিয়েই তারা ভুলে থাকে। রোগে শোকে জরা-মৃত্যুকালে একজন গুরু মিলে গেলেই তাদের সর্বার্থসিদ্ধি। এসব যদি সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া যায় তবে ধনী দরিদ্রে ভেদ থাকে না। সবাইকে নিয়ে হয় সমসমাজ। কিন্তু কোথায় সেই হিউমান ডিগনিটি, যা বহু তপস্যার ফল?

যৌবনে পড়েছিলুম Julien Benda প্রণীত ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ। 'La Trahison des clercs' বা বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসঘাতকতা সৈনিকদের বিশ্বাসঘাতকতার মতোই ভয়ঙ্কর। এঁদের বিশ্বাসঘাতকতা দেশের বা রাষ্ট্রের প্রতি নয়, মানুষের জীবনের যা শ্রেষ্ঠ মূল্য তার প্রতি। সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি, প্রেমের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি, কল্যাণের প্রতি। জাতিবৈর, শ্রেণীবৈর, বর্ণবৈর, এঁদের হিংসা প্রতিহিংসার আবর্তে টেনে নিয়ে যায়। ভারতে তো আমরা দেখলুম সম্প্রদায়বৈর কী নৃশংসতাই না ঘটাল! সেদিন বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাস-ঘাতকতাও দেখা গেল।

এখন কথা হচ্ছে, কাদের স্বাধীনতার জন্যে আমি লড়তে যাব? যেসব বুদ্ধিজীবী স্বাধীনতা পেলেই তা দিয়ে মানবিক মূল্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তাঁদের স্বাধীনতার জন্যে? যেসব ব্রহ্মদৈত্যকে বোতলে বন্ধ করে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের বোতলের ছিপি খুলে দিলেই কি তাঁদের স্বভাব শোধরাবে? তাঁরা নিরীহজনের ঘাড় মটকাবেন না? সমস্যা তো এইখানেই যে শাসকদের মতে এঁদের আবদ্ধ রাখাই নিরাপদ। অথচ এঁদের মধ্যে আমি সৎ লেখকদেরও দেখছি। Socrates যাঁদের বলতেন gad-fly। মাছি যেমন কামড়াতে কামড়াতে গোরুকে জ্বালাতন করে তেমনি সমাজকে তিনিও প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে তিক্ত বিরক্ত করতেন। গণতন্ত্রে বিরক্তিকারী সমালোচকেরও একটা স্থান আছে। তেমন মানুষকে বিনা বিচারে আটক করে রাখা কি গণতন্ত্রের পক্ষে হিতকর? তাই যদি

হতো তবে গ্রীসের সেই গৌরবময় গণতন্ত্র টিকতে পারল না কেন? কাকে আবদ্ধ রাখলে গণতন্ত্র নিরাপদ হয়, কাকে আবদ্ধ রাখলে বিপন্ন হয়, এটা কি কর্তারা ভেবে দেখবার সময় পান? আমি তো লিখে জবাব পাইনি।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হলো এতে প্রত্যেকটি নাগরিককেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, যতক্ষণ না সে-স্বাধীনতা অপরের স্বাধীনতার অন্তরায় বা দেশের স্বাধীনতার বৈনাশিক বা চিরাচরিত ধর্মের হন্তারক বা সুপ্রতিষ্ঠিত নীতিমালার বিধ্বংসী বা সমাজশৃঙ্খলার বিস্ফোরক হয়। লেখকরাও নাগরিক, সুতরাং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাদেরও আছে। বলা বাহুল্য তাদের সেই স্বাধীনতাও শর্তাধীন। নিঃশর্ত স্বাধীনতা কোনো লেখক কোনো কালেই পাননি, কোনো দেশেই তার নজীর নেই। গণতন্ত্রেও প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিধিনিষেধ আছে। সেসব যদি অযৌক্তিক বা আরবিট্রারি হয় তাহলে লেখকরা প্রতিবাদ করেন, প্রতিবাদ ব্যর্থ হলে প্রতিরোধ করেন। তা করতে গিয়ে কেউ আগুনে পুড়ে মরেছেন, কেউ কারাবাস করেছেন, কেউ বা নির্বাসিত হয়েছেন, কেউ কেউ জরিমানা দিয়েছেন, কারো কারো বই নিষিদ্ধ হয়েছে বা পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বহু দেশের ইতিহাস বাক্‌স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের ইতিহাস। যে দেশ গণতন্ত্রী বলে পরিচিত তার ইতিহাসেও এর নজীর আছে।

সেনসরশিপ আমাদের জীবনে নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলেও আমরা ও জিনিস দেখেছি। যেটা দেখিনি সেটা হলো প্রাক্‌সেনসরশিপ। না, সেটাও ছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন পত্রিকাবিশেষের সম্পাদকীয় রচনা সরকারকে দেখিয়ে নিতে হতো, রাষ্ট্র বিপন্ন হতে পারে এই যুক্তির জোরে। আমরা তো ভাবতুম গায়ের জোরে। তাছাড়া নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নাটক-টাকেও পুলিশের কাছে পেশ করা হতো, পুলিশ তাতে দাগ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট-কে দিয়ে মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিয়ে নিত। একবার এ কর্ম আমাকেও করতে হয়। পুলিশের আপত্তি মানে তো কোনো এক সাহিত্যরসিক দারোগার আপত্তি। আমি দারোগার লেভেলে নামতে পারিনে। কিন্তু কী করি? পুলিশের আপত্তি ষোল আনা খারিজ করলে আমার নামেই রিপোর্ট যাবে যে আমি সন্ত্রাসবাদের প্রচ্ছন্ন প্ররোচনা সমর্থন করি। পুলিশ অফিসারদের ডেকে পাঠাই। তাঁদেরও সেই একই আশঙ্কা। একরাশ আপত্তিকর অংশ বন্ধনীভুক্ত না করলে সাহেব মনে করবেন তাঁরাও সন্ত্রাসবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক।

বইখানার নাম যতদূর মনে পড়ে 'কেদার রায়'। মোগল আমলের কাহিনী। কোথায় ইংরেজ, কোথায় সন্ত্রাসবাদ, কোথায় রাজদ্রোহ, কোথায় কী! বাদসাদ দিয়ে অভিনয়ের জন্যে মঞ্জুর করতে হয়। না-মঞ্জুর করলেও কে আমাকে দোষ দিত? সেকালে একটি ম্যাজিক ফরমূলা ছিল। "পাবলিকের স্বার্থে নয়" লিখে বইখানা ফেরৎ দিলেই সাতখুন মাফ। অভিনয় বন্ধ। পাবলিক অসন্তুষ্ট। আমারও প্রমোশন। দারোগারও।

দেশসুদ্ধ সাহিত্যিকের গল্প, উপন্যাস, কবিতাও আজকাল গুটিকয়েক আমলাকে দিয়ে দেখিয়ে নিতে হয়। তাঁরা যে কত বড়ো সাহিত্যরসিক তার প্রমাণ আমরা ভুরি ভুরি পাচ্ছি। কিন্তু প্রতিবাদের উপায় নেই। প্রতিবাদটাও প্রকাশিত হবে না। প্রতিরোধ করতে গেলে কারাবাস। নয়তো বাজেয়াপ্তি। কেন আমার গল্পের দু'লাইন বাদ গেল তার কৈফিয়ৎ আমি আজও পাইনি। গল্পটা জরুরী অবস্থার পূর্বেই লেখা ও সম্পাদকের দফতরে পাঠানো। তাতে রাজনীতির নামগন্ধ ছিল না। লিখেছিলুম, "হুঁ! হুঁ! তুমি জানো সবই কিন্তু বলবে না। এ কালে ওষুধের মাত্রা কমেছে। অনুপানের মাত্রা বেড়েছে। ইংরেজ নেই, এখন সব জায়গায় স্কচ্।"

সেনসরশিপ যদি আরবিট্রারি হয় তার প্রতিকার আছে। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হলেও তার আগেই হাজার হাজার বিক্রী হয়েছিল। পুলিশ ঘরে ঘরে হানা দিয়েও সমস্ত কপি উদ্ধার করতে পারেনি। তা ছাড়া ইংরেজ আমলে বাজেয়াপ্ত বইও সযত্নে রক্ষা করা হতো। সরকারের হেফাজতে। স্বাধীনতার পর আমাদের এক চীফ সেক্রেটারি অবসরকালে সেসব বই পড়ে আমোদ পেতেন। আমাকেও বলেন, "রায়, পড়বে নাকি?" আমি সময় পাইনে। ছিলুম তো মাত্র ছ'মাস সেক্রেটারিয়াটে। চোরা কক্ষটা আমার দেখা হয়নি। সরকার বদলের পর সেসব বাজেয়াপ্ত বই এখন বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। বিলেতে যখন ছিলুম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের চোরা কক্ষে গিয়ে নিষিদ্ধ গ্রন্থ পড়ার অনুমতি পেতুম। কতক বৈপ্লবিক, কতক অশ্লীল। ওরে বাবা! কী কড়া পাহারা! আমাকে নিয়ে যেত আলীবাবার মতো চোখ বেঁধে নয়, তবে কতরকম চোরা পথে। ইংরেজরা কিছুই নষ্ট করত না। ভাবীকালের জন্যে রেখে দিত।

কিন্তু প্রাক্‌সেনসরশিপের বেলা সে কথা খাটে না। আমার গল্পের যে-

অংশটা কাটা গেল তার নকল যদি আমার কাছে না থাকে বা থাকলেও পরে হারিয়ে যায় তা হলে সরকারের কোনো ক্ষতি হলো না, কিন্তু সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হলো। গল্পটার রস মাটি হলো। সরকার দীর্ঘায়ু হোন, কিন্তু সাহিত্য কি তাঁদের চেয়েও দীর্ঘজীবী নয়? সাহিত্যের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করলে কি ভাবীকালের কাছে জবাবদিহির দায় নেই তাঁদের? বিশুদ্ধ সাহিত্যিক সৃষ্টিকে প্রাক্‌সেনসরশিপের উর্ধ্বে রাখাই সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন। কিন্তু সাহিত্যিকরা কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেন না। ইংরেজ সরকারের অধীনস্থ কর্মচারী বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন 'আনন্দমঠ' ও তারই ভিতরে ছিল 'বন্দে মাতরম্'। সেকালে যদি প্রাক্‌সেনসরশিপ প্রচলিত থাকত তা হলে 'বন্দে মাতরম্' নির্ঘাত কাটা পড়ত। ওটা কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়নি? বঙ্কিম হয়তো জানতেন না যে ওটা হবে সংগ্রামের মন্ত্র। তেমনি আমরা কেউ জানিনে আমাদের কোন্ রচনা কবে কার দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক যেন এ ঘরের সঙ্গে ও ঘরের। কখনো এ ঘরের হাওয়া ও ঘরে যায়। কখনো ও ঘরের হাওয়া এ ঘরে আসে। সাহিত্য ও রাজনীতি এক নয়। অথচ বিচ্ছিন্নও নয়। মিলটন, ভলতেয়ার, রুশো, শেলী, হুগো, রম্যা রলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, কি কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন? মহাত্মা গান্ধী শেলীর 'প্রোমিথিউস আনবাউণ্ড' থেকে যা উদ্ধার করেন তা রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রেরণাদায়ক। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শেলীর কাছেও ঋণী। যেমন বঙ্কিমের কাছে। গান্ধীজীকে 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে'র দীক্ষা দেন থোরো, নন্‌ভায়োলেন্সের শিক্ষা দেন টলস্টয় আর সর্বোদয়ের প্রেরণা দেন রাস্‌কিন। এঁরা কেউ রাজনীতিক ছিলেন না, অথচ বিশুদ্ধ সাহিত্যিকও নন।

তা ছাড়া সমালোচনার অধিকারও নাগরিকমাত্রের স্বাধিকার। যে-ই কর দেয় সে-ই সমালোচনা করে। যে-ই ভোট দেয় সে-ই সমালোচনা করে। আমরা লেখকরাও কি কর দিইনে, ভোট দিইনে? কেন আমরা সমালোচনা করব না? সমালোচনা করলেই বিরোধীপক্ষভুক্ত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আমি তো বিরোধীপক্ষের ধার ধারিনে। যখন যাঁকে যোগ্যতম মনে করি তখন তাঁকেই ভোট দিই। চোখ বুজে ল্যাম্পপোস্টকে ভোট দিইনে। আমি একজন নির্দলীয় নাগরিক। আমার সমালোচনা পক্ষদুষ্ট নয়। পলিসিতে ভুল থাকলে সেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। সে কাজ

আমি করেছিলুম ভারত চীন সংঘর্ষের সময়। স্বয়ং বিনোবাজী আমার লেখা পড়েন। বাংলা তিনি বোঝেন। পরে দেখি ওটি মারাঠীতে তর্জমা হয়েছে। তখন যদি প্রাক্‌সেনসরশিপ থাকত আমার 'যোগভ্রষ্ট' ছাপতে দেওয়া হতো না, কিংবা দিলেও দেওয়া হতো সেই পর্যন্তই যে পর্যন্ত ভারতের অনুকূলে যায়। যুদ্ধবিগ্রহের rights and wrongs বা ন্যায় অন্যায় চিরকাল আমাকে চিন্তিত করেছে। না করলে কি আমি একজন ইনটেলেকচুয়াল বলে গণ্য হতুম? দেশের পক্ষে কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা নয়, এবিষয়ে আমারও একটা নিরপেক্ষ মত থাকতে পারে। পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে তা যদি না মেলে তবে তাঁরাই ঠিক, আমি বেঠিক, এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইতিহাসই বলতে পারে জাতীয় সঙ্কটের দিন রাজনীতিকরা দূরদর্শী, না চিন্তাশীল লেখকরা দূরদর্শী। এক্ষেত্রে প্রাক্‌সেনসরশিপ একটা অদূরদর্শী হস্তক্ষেপ।

প্রাক্‌সেনসরশিপের বিপক্ষে মিলটন যা লিখে গেছেন তা যুগে যুগে ও দেশে দেশে প্রযোজ্য। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তিনিও স্বীকার করতেন যে প্রকাশনের পরে সেনসরশিপ বাঞ্ছনীয় হতে পারে। স্বাধীনতা বলতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা বোঝায় না। নিরঙ্কুশরা কী পরিমাণ ক্ষতি করতে পারে আমি নিজেই তো তার ভুক্তভোগী। প্রকাশনের পূর্বে নয়, পরে যদি দেখা যায় যে, লেখক রাষ্ট্রের বা সমাজের বা ব্যক্তির ক্ষতি করেছেন তা হলে আইনের শাসন তাঁকেও মানতে হবে। আমি শুধু এইটুকুই নিবেদন করব যে, তাঁকে বিনা বিচারে আটক না করে বিচারের জন্যে আদালতে পাঠানো উচিত। তাঁর রচনাই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সুতরাং সাক্ষীর অভাব হবেনা। যারা চোরা কারবারী বা মাল পাচারকারী বা সন্ত্রাস-বাদী তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করা কঠিন। সাক্ষীর অভাবে তারা খালাস পেয়ে যেতে পারে। তাদের বেলা বিনা বিচারে আটকের নজীর আছে। কিন্তু যাদের রচনা জোগাড় করা একটুও কঠিন নয় তাদের বিনা বিচারে আটক করা কি যুক্তিসঙ্গত? আইন ভঙ্গ করে থাকলে যাক না তারা জেলে, কিন্তু বিনা বিচারে আটকের ভয় থাকলে সব লেখকেরই লেখা ভয়ে আড়ষ্ট হবে। মনের কথা খুলে বলতে কেউ সাহসী হবেন না। লিখবেন যা, তার বাইরে একরকম অর্থ, ভিতরে আরেক রকম। এ ধরনের সাঙ্কেতিক লেখা রাজতন্ত্রের বা পুরোহিততন্ত্রের দাপটের দিনে প্রচলিত ছিল। সমাজ-

তন্ত্রের দাপটের দিনেও অপরাপর দেশে লক্ষিত হচ্ছে। এদেশেও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে?

আমরা যা লিখব তার পূর্ণ দায়িত্ব নেব। তার জন্যে দরকার হলে দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে যাব। তবু সরস্বতীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করব না। পাঠকের সঙ্গে কপটাচরণ করব না। যাঁদের তত সাহস নেই বা সহনক্ষমতা নেই তাঁরা সাঙ্কেতিক রচনার শরণ নিতে পারেন। ইতিহাসে তার বহু নজীর আছে। যে কথা বলার জন্য আমরা পৃথিবীতে এসেছি সে কথা যদি ছাপার অক্ষরে দিনের আলো দেখতে না পারে তো পাণ্ডুলিপি আকারে অপ্রকাশিত থাকবে। কিন্তু ভিতর থেকে লেখার তাগিদ যদি থাকে তবে লিখে যেতেই হবে। লেখার জন্যেই বাঁচা। শুধু শুধু বেঁচে থাকা অর্থহীন। আর লেখা কেবল কলম পেষা নয়, ফরমাশ খাটা নয়। লেখা হচ্ছে আত্মপ্রকাশ। যেখানে আত্মপ্রকাশ নেই সেখানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশও মূল্যহীন। স্বাধীনতা চাই লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের জন্যেই। সেটাই লেখকের ধর্ম। লেখার স্বাধীনতা যেন একপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা।

পুরুষার্থ

যে ডালে বসেছে সেই ডালটাই কাটছে, এরকম একটি লোকের কাহিনী ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। কাহিনীটা ছিল হাস্যরসাত্মক। কিন্তু সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে করুণ রসও আছে। একটি স্বাধীন দেশের সর্বস্বীকৃত সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা সংবিধানকেই এমনভাবে পরিবর্তন করতে উদ্যত হয়েছেন যে তাঁদের নিজেদেরই বাক্‌-স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌল অধিকার হতে যাচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল, মারাঠা ও ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অনুরূপ। তাহলে এত খরচপত্র করে পার্লামেণ্টারি নির্বাচনের প্রয়োজনটা কী? যার প্রয়োজন নেই তাকে আর কতকাল টিকিয়ে রাখা যাবে? এর পরে হয়তো আর একটা চ্যালেঞ্জ আসবে। তার মোকাবিলা করতে গিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থাটাই রদ করা হবে। করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই। সুতরাং বলতে পারা যাবে না যে কাজটা অগণতান্ত্রিক।

ইউরোপের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তারা জানেন যে গত দুই শতাব্দী ধরে ফরাসীরা উভয় সঙ্কটে আরূঢ়। দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে অজস্র প্রাণের মূল্য দিয়ে 'ত্যাগের মূল্য দিয়ে লাভ করা গেল দেবভোগ্য মৌল অধিকার। কিছুকাল পরে দেখা গেল কতক লোক তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতাকেই ব্যবহার করছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ধ্বংসের কাজে। কেউ বা তাদের বামপন্থী, কেউ বা দক্ষিণপন্থী। তখন তাদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হয়। নিয়ন্ত্রণ করতে করতে একদিন সংবিধানটারই খোল আর নলচে বদলে দিতে হয়। কিংবা তাকে সরাসরি বাতিল করতে হয়। তা বলে সেই কি শেষ কথা? না, তার পরে আর একদফা সংগ্রাম, রক্তক্ষয়, কারাবাস, ত্যাগস্বীকার।

ইংরেজরা কিন্তু এক চরম পন্থা থেকে আরেক,চরম পন্থায় লাফ দিয়ে চলে না। তারা স্বভাবত মধ্যপন্থী। কত দূর এগোতে হয়, কোনখানে দাঁড়ি টানতে হয়, কখন আবার স্বাধিকারের সীমানা আর একটুখানি বাড়িয়ে নিতে হয় এটা তাদের মজ্জাগত। এর জন্যে চাই অতন্দ্র পাহারা। এমন কয়েকটি পত্রিকা বা সংস্থা থাকে, এমন কয়েকজন লেখক বা বক্তা থাকেন, যাদের বা যাঁদের বলা যেতে পারে অতন্দ্র প্রহরী। রবিবারে লণ্ডনের হাইডপার্কে গেলে দেখবেন একটি কাঠের বাক্স জোগাড় করে তার ওপর দাঁড়িয়ে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বক্তৃতা করে চলেছে এক উৎসাহী পুরুষ বা নারী। শুনছে হয়তো পাঁচজন কি দশজন। শুনে হয়তো টিটকারী দিচ্ছে। কিংবা প্রতিবাদ করছে। বক্তা অদম্য। কেউ কেউ তো শিকল দিয়ে নিজেকে বেঁধে রাখেন যাতে স্থানচ্যুত হতে না হয়। এছাড়া রাস্তার মোড়ের বক্তৃতা তো লেগেই থাকে। লোক চলাচল বন্ধ না করে নিজের বক্তব্যটা পথিকদের ডেকে শুনিয়ে দেওয়া যায়।

পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরী করার আরো একটা জায়গা পাব্‌ বা পানশালা। তবে সেখানে আমি যাইনি। সভাসমিতির উপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। পানশালার উপর নয়। ইংরেজরা সেখানে যাবেই, পানপাত্র নিয়ে বসবেই, যা খুশি বলবেই। কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? সাধারণ পুলিশে কুলোবে না। জনসাধারণের একাংশ দমনকার্য হাতে না নিলে অধিকাংশের কণ্ঠরোধ দুরাশা। ইংরেজরা কখনো ফাসিস্টদের প্রশ্রয় দেয়নি। তার দরকার হয়নি। যেদেশে কমিউনিজম প্রবল হয়েছে সেই দেশেই ফাসিজম প্রবলতর হয়ে তাকে রুখতে গেছে। যেমন ইটালীতে বা জার্মানীতে। রুশবিপ্লবের পূর্বে ফাসিজমের অস্তিত্ব ছিল না। কমিউনিস্টরা বিশ্ববিপ্লব চায় এই আশঙ্কায় ফাসিজমের আবির্ভাব। সে আশঙ্কা ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে ছিল না। তাই সেসব দেশে ফাসিস্টরা আমল পায়নি।

গণতন্ত্র আমাদের দেশে অর্বাচীন। আমাদের ইতিহাসে এর শিকড় নেই। এই অমূল তরু যদি আপনাকে আপনি উচ্ছেদ করে তবে জনসাধারণ এর জন্যে অশ্রুপাত বা রক্তপাত করবে না। ওরা বোঝে ব্রেড আর সার্কাস। ভাত কাপড় আর পালাপার্বণ। এর জন্য কেউ যদি তাদের বেগার খাটিয়ে নেয় তাহলেও যে তারা খুব একটা আপত্তি জানাবে তা নয়। বিদ্রোহ বা বিপ্লব তো দূরের কথা। করলে করবে তখনি, যখন তাদের ভাত কাপড়ে টান

পড়বে কিংবা সঙ, তামাশা বন্ধ হয়ে যাবে। রাজতন্ত্র ও আমলাতন্ত্র এ তত্ত্ব ভালো করেই বুঝত। সমাজতন্ত্রও যে না বোঝে তা নয়। অবুঝ যদি কেউ থাকে তবে তাদের বলে গণতন্ত্রী। তারা ভাত কাপড়ে বা রঙ, তামাশায় ভুলবে না। বলবে, কী করব আমি এসব নিয়ে, যদি বাক্ স্বাধীনতাই না থাকল? যদি না থাকল মত প্রকাশের ও মতদানের স্বাধীনতা? নির্বাচন যাকে বলা হয় তা তো এক প্রকার মতপ্রকাশ ও মতদান। আমার মত আমি ব্যালট বাকসের মাধ্যমে প্রকাশ করব, দান করব, এ বিষয়ে আমার মনোনয়নের অবকাশ ও পরিসর থাকা চাই। নির্বাচনকালে একজনমাত্র প্রার্থী থাকলে নির্বাচনের কথা ওঠে কী করে? অন্তত চাই দুজন প্রার্থী। একদলের নয়, দুই দলের। গণতন্ত্র কখনও একদলীয় ব্যাপার হতে পারে না। হলে হবে দলতন্ত্র।

দলতন্ত্র এখন বহু দেশ মেনে নিয়েছে। ভারতও মেনে নিতে পারে। কিন্তু দোহাই, দাদা, একে গণতন্ত্র বলে গোঁজামিল দিয়ো না। দেশে কিছু না হোক লাখখানেক বুদ্ধিজীবী তো আছেন। এঁরা হয়তো ইউরোপ আমেরিকায় যাননি, তবু গত দুই তিন শতাব্দীর পাশ্চাত্য ইতিহাস পড়েছেন। গণতন্ত্র কেমন করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে তার খবর রাখেন। গণতন্ত্রের প্রকারভেদও তাঁদের জানা। একথা এঁরা বলবেন না যে ভারত অমুক দেশের অন্ধ অনুবর্তী হবে। দেশভেদেও প্রকারভেদ হয়। ভারত দেশটা আর কোনো দেশের মতো নয়। তার গণতন্ত্র আর কোন দেশের মতো হতে বাধ্য নয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটা কে নেবে? মনোনয়নের অধিকারটা কার? আমার, না আমার পাঁচবছর আগেকার প্রতিনিধির যিনি আমার ঘরে আসেন না, আমার কথা শোনেন না, আমার লেখার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন প্রি-সেনসরশিপ, আমাকে পড়তে দেন না সেনসর না হওয়া লেখা বা খবর। আমার মত আমি স্থির করব কেমন করে? শুধু একপক্ষের বক্তব্য শুনে?

গণতন্ত্র এদেশে আমারি জীবদ্দশায় ধাপে ধাপে প্রবর্তিত হয়েছে। মর্লে-মিণ্টো, মণ্টেগু-চেমসফোর্ড প্রভৃতি প্রত্যেকটি ধাপ আমার দেখা। ছেলেবেলা থেকেই আমি খবরের কাগজের খোরাকে পুষ্ট। সাতবছর কি আটবছর বয়সে বাবা আমাকে পড়তে দেন 'বসুমতী' সাপ্তাহিক ও বছর দুই বাদে 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক, পরে দ্বিসাপ্তাহিক। আর একটু বড়ো হয়ে কতরকম দেশী ও বিদেশী পত্রিকা যে আমি চোখ দিয়ে গিলেছি তার শুমারি নেই। জোগাড়

করেছি নানান সূত্র থেকে। চেয়েছি সাংবাদিক হতে। তাও বিদেশে গিয়ে। আমি সমুদ্রের মাছ। আমি কখনো ডোবার মাছ হতে পারি? আমি খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে অভ্যস্ত। আমি কখনো বদ্ধ কক্ষে নিঃশ্বাস নিতে পারি? সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমার কোনো প্রেজুডিস নেই। আঠারো উনিশ বছর বয়স থেকেই আমি ওই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত। লোকে যদি সমাজতন্ত্র চায় তো সমাজতন্ত্রই হবে। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায়··নয়, লোকের ইচ্ছায়। লোকের মধ্যে আমাকেও গণনা করতে হবে। আমার মতামতও শুনতে হবে। ব্যক্তি বাদ দিয়ে সমাজ নয়। ব্যক্তির স্বাধিকারকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র নয়। যেখানে তেমন চেষ্টা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিকে বলি দিতে হয়েছে। তার স্বাধিকারকে বিনাশ করতে হয়েছে। তার ফলে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ও সত্যান্বেষী দর্শনের স্রোত শুকিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে তা ঠিক। সেটাও প্রধানত ফলিত বিজ্ঞানের। নতুন থিওরি কোথায়?

বহু শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে ব্যক্তিকে দমন করে রেখেছিল সমাজ তথা রাষ্ট্র। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা দিয়েছিল ধর্ম। তাই সৃষ্টির লীলা নিবদ্ধ ছিল ধর্মীয় সাহিত্য বা শিল্পে। দর্শনও ছিল ধর্মের আঁচল বাঁধা। আমাদের সেই উত্তরাধিকার পরম বিস্ময়কর। কিন্তু যুগের পর যুগ তারই অনুবৃত্তি চলতে থাকলে মানবাত্মা নিজেই শ্রান্ত ক্লান্ত নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন যার প্রয়োজন হয় তার নাম রেনেসাঁস। নতুন করে বাঁচতে হয়, ভাবতে হয়, বিচার করতে হয়, অন্বেষণ করতে হয়, আবিষ্কার করতে হয়, কল্পনা করতে হয়, সৃষ্টি করতে হয়। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। চাই কায়িক, মানসিক, বাচনিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতা। চাই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পূর্ণতা। এসব মূল্যের মহিমা ধর্মীয় সাহিত্যে ছিল না। এসেছে রেনেসাঁসের মূল সুর হিউমানিজম থেকে। মানবিকবাদ একদিকে বিজ্ঞানের অন্যদিকে শিল্পের নব নব উন্মেষ ঘটিয়েছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তারই সোনালী ফসল গণতন্ত্র।

ইংরেজ সাহিত্যিক ফরস্টার গণতন্ত্রকে থ্রী চীয়ার্স দেননি, দিয়েছেন টু চীয়ার্স। কারণ গণতন্ত্র মানুষকে শাসক মনোনয়নের ও পরিবর্তনের অধিকার সমেত বহুবিধ মৌল অধিকার দিলেও দীনতম, হীনতম ও দুর্বলতম মানুষের আর্থিক দাসত্ব মোচন করতে পারেনি। সুতরাং গণতন্ত্র যদি থ্রী চীয়ার্স চায়

তবে তাকে দীনতম, হীনতম ও দুর্বলতম মানুষের আর্থিক দাসত্ব মোচন করতে হয়। গণতন্ত্রকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করাটাই আদর্শ। তার জন্যে যা যা করণীয় তা করা হোক। আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। কিন্তু তোমরা যদি গণতন্ত্রকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না করে তাকে অঙ্গহীন করাটাই শ্রেয় মনে কর তাহলে আমরা কেমন করে তোমাদের সঙ্গে থাকি? তখন থ্রী চীয়ার্স তো পাবেই না, টু চীয়ার্স দিতেও আমরা কুণ্ঠিত হব। তোমরা হয়তো বলবে অমন একটা বিকলাঙ্গ গণতন্ত্রের বদলে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সমাজতন্ত্র তো মিলবে। তাকেই বা থ্রী চীয়ার্স দেওয়া হবে না কেন? সমাজতন্ত্র কি ইতিহাসের উচ্চতর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাস কি তারই অভিমুখে যাত্রা করছে না? কোনো কোনো দেশে কি ইতিমধ্যেই উপনীত নয়? মুষ্টিমেয় বুর্জোয়া ছাড়া গণতন্ত্রের জন্যে কার মাথা ব্যথা? আর ডেমোক্রাসী শব্দটার যদি এতখানি আকর্ষণ থাকে তবে পীপলস্ ডেমোক্রাসী কেন নয়? এমন কী কথা আছে যে তাকে পার্লামেণ্টারি হতেই হবে?

সিডনি ওয়েব প্রমুখ ফেবিয়ানরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে পার্লামেণ্টের উপযোগিতা না দেখে বিকল্পের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ফাসিস্টরা তার সুযোগ নেবে ও শ্রমিকরা বঞ্চিত হবে বলে লেবার পার্টি ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন ওয়েব দম্পতী সোভিয়েট কমিউনিস্টদের মধ্যে তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত নতুন সভ্যতার পূর্বাভাষ পান। ইংলণ্ডের দীন হীন ও দুর্বলতম জন যারা তারা পর্যন্ত ওর উপর বিমুখ। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী ওদের রক্তমাংসের ও অস্থিমজ্জার সমিল। ওর সংস্কার যত ইচ্ছা হোক, কিন্তু বিলোপ কোনোমতেই নয়; সামাজিক ন্যায়ের অনুরোধেও শতকরা একজন কি দু'জন ভিন্ন আর কোন ইংরেজ ওর বিলোপ চায় না। এরা কমিউনিস্ট। কিন্তু কমিউনিস্ট অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে শ্রমিক শ্রেণীর লোক প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে একটা না একটা ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দিতে হবে, সেই ট্রেড ইউনিয়নকে জোরদার করতে হবে। অকমিউনিষ্টরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে যে অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে জোট বাঁধতে হবে, সব ক'টা ট্রেড ইউনিয়ন মিলে ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস গড়ে তুলতে হবে, সেই কংগ্রেস হবে পার্লামেণ্টের বাইরে শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির ঘাঁটি। পার্লামেণ্ট যতদিন না করায়ত্ত হচ্ছে ততদিন ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থের সংরক্ষক। পার্লা-

মেণ্টারি নির্বাচনের সময় শ্রমিকরা কেউ ব্যক্তি হিসাবে ভোট দেয় না, দেয় ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বলে ও সদলবলে। এর নাম ব্লক ভোটিং। কাকে ভোট দিতে হবে সেটা ট্রেড ইউনিয়নই নির্দেশ করে। তা হলে আর ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে কোথায়? আছে, যারা ভিন্নপন্থী তাদের।

ইংলণ্ড তার নিজস্ব ধারায় দিন দিন সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উৎখাত করে নয়। বরং শ্রমিকদের সন্তানরাই হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্ত। বিয়ে করেছে উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে। এটাও একপ্রকার বর্ণচোরা সমাজবিপ্লব। রানী ভিক্টোরিয়া কি ভাবতে পারতেন যে রাজকুমারী মার্গারেট বা রাজকুমারী অ্যান প্রতিলোম বিবাহ করবেন? চার্লস যখন রাজা হবেন তাঁর রানী যে রাজবংশীয়া হবেনই এমন কোন নিয়ম আছে কি? কে জানে হয়তো শ্রমিককন্যারই পাণিগ্রহণ করে রাজতন্ত্র রক্ষা করবেন। রাজতন্ত্র রক্ষা পেলে অভিজাততন্ত্রও রক্ষা পায়। ইংলণ্ডের অভিজাতরা এ তত্ত্ব বোঝেন বলেই বহুসংখ্যক শ্রমিকবংশীয়কে জাতে তুলে নিয়েছেন লর্ড উপাধি দিয়ে। আজকাল তো লেডী উপাধিও দেওয়া চলে। এঁরা মুখে রাজা উজীর মারলেও তাঁদের শিবিরে এক পা রেখেছেন, আর এক পা শ্রমিক শিবিরে।

ভারতের নেতারা সংবিধান প্রণয়ন করতে বসে নানা দেশের সংবিধান মিলিয়ে দেখেন ও স্বদেশের জন্যে ইংলণ্ডের সংবিধানকেই শ্রেয় বিবেচনা করেন। তবে চোখ বুজে অনুকরণ করেন না, প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করেন। পার্লামেণ্টকে তাঁরা ইংলণ্ডের মতো সোভরেন করেন না, জুডিসিয়ারিকে ক্ষমতা দেন পার্লামেণ্ট কী করে না করে তা খতিয়ে দেখার, ভুল করলে শুধরে দেবার, ক্ষমতার বাইরে পা বাড়ালে নিবৃত্ত করার। এখন পার্লামেণ্ট চাইছে সংবিধানের সংশোধন করে নিরঙ্কুশ হতে, সোভরেন হতে, ইংলণ্ডের মতো হতে। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এটা নাকি দরকারী হয়ে পড়েছে প্রাইভেট সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের জন্যে। সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এটা নাকি একটা অপরিহার্য পদক্ষেপ। দীন হীন ও দুর্বল যারা তারা তো এর অনুকূলে ভোট দেবেই। তাদের ভোটদানের অধিকার থাকবে। ক্ষতি যেটা হবে সেটা জুডিসিয়ারির। জুডিসিয়ারিকে বলহীন করলে সে আর মৌল অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না কাউকেই। ধনীকেও না, নির্ধনকেও না। পার্লামেণ্ট যদি একদিন ফাসিস্টদের

কবলে পড়ে তাহলে তাদের দ্বারা নির্যাতিতদেরও না। পার্লামেন্ট যদি একদিন কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে তাহলে তাদের দ্বারা উৎপীড়িতদেরও না। সৈনিকরা তাকে ভেঙে দিলে তাদের দ্বারা নিহতদেরও না। শেখ মুজিবুর রহমানও ভালোর জন্যেই সংবিধান সংশোধন করে পার্লামেন্টকে সর্বেসর্বা ও জুডিসিয়ারিকে অথর্ব করেছিলেন। এখন কোথায় সেই সংশোধিত সংবিধান? সামরিক শাসকরা সেটাকে যখন খুশি উপেক্ষা করছেন, যখন খুশি নিজেদের কাজে লাগাচ্ছেন। বড়লোকরাও গরীব হয়নি, গরীবরাও বড়লোক হয়নি। মাঝখান থেকে কাটা পড়েছে গণতন্ত্র। বিনা যুদ্ধে তার পুনঃপ্রবর্তন হবার নয়।

গণতন্ত্র বলতে আমি বুঝি পার্লামেন্টারি শাসনতন্ত্র। ও জিনিস ইংলণ্ডে বিবর্তিত হতে তিন শতাব্দী লেগেছে। এদেশে ওর সূচনা উনিশ শ' একুশ সালে যখন নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে গোটা কয়েক দপ্তর দিয়ে লাটসাহেব করেন তত্ত্বাবধান। ওর আদত কথাটা হলো মন্ত্রীরা দায়ী পার্লামেন্টের কাছে আর পার্লামেন্ট দায়ী নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে। রাজার বা রাজপ্রতিনিধিদের কাছে কেউ দায়ী নন। ইংরেজ সরকার সেটা মেনে নেন ১৯৪৭ সালে। ভারতের সংবিধান সভার অনুকূলে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদেশ থেকে বিদায় নেন। তারপর তৈরী হয় লোকায়ত সংবিধান। এরই ভিত্তিতে পর পর কয়েক দফা নির্বাচন হয়ে গেছে। কিন্তু এদেশের লোকের অভিজ্ঞতা তিন শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়নি। এমন কি তিন পুরুষের অভিজ্ঞতাও নয়। যেখানে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সেখানে রাতারাতি ফল পাবার জন্যে একটা বনস্পতিকে ছেঁটে কেটে ছোট করলে বা গোড়া ঘেঁষে উচ্ছেদ করলে যেটা হবে সেটা আর যাই হোক্ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র নয়।

তাহলে কি সেটা প্রেসিডেনসিয়াল গণতন্ত্র? নয়, তাও নয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্ট সম ক্ষমতার অধিকারী। সোভরেন কেউ এককভাবে নন। ও জিনিস এদেশে প্রবর্তন করলে পাঁচটা বছরও টিকবে না। বাকী থাকে পিপলস ডেমোক্রাসী। যেমন রাশিয়ায় বা চীনে। সেসব দেশের সরকার আইনসভার কাছে দায়ী নন, আইনসভা নির্বাচকদের কাছে দায়ী নয়। ক্ষমতাকে তিনভাগে ভাগ করে দেওয়াও হয়নি। আইনসভা আজ্ঞাবহ, সুপ্রীম কোর্ট অথর্ব। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সোভিয়েট রাশিয়া ষাট বছরের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তিতে পরিণত

হয়েছে ও গণচীনকে চল্লিশ বছর সময় দিলে সেও বিশ্বের তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হবে। এরা শুধু যে বিশ্বশক্তি হয়েছে বা হতে যাচ্ছে তাই নয় সাধারণ লোকের আর্থিক অবস্থারও বিস্ময়কর উন্নতি ঘটিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়ে। দেখেশুনে দুনিয়ার অনুন্নত দেশগুলো এখন আর ইংলণ্ড বা আমেরিকার দিকে তাকায় না, তাকালে তাকায় আর্থিক সাহায্যের জন্যে। এখন ওরা চায় সোভিয়েট রাশিয়ার বা গণচীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রকে পাঁচ সাত বছর সময় দিতে না দিতেই তাকে কবরে পাঠাচ্ছে। কিংবা তাঁকে কেটেছেঁটে এমন রূপ দিচ্ছে যে চিনতেই পারা যাচ্ছে না সেটা হাঁস না সজারু না হাঁসজারু।

আমাদের নেতারা আর ইংলণ্ডের দিকে তাকান না, তাকান চীনের দিকে। জনগণ তো কোন কালেই ইংলণ্ডের জনগণের মতো রাজনৈতিক অধিকার সচেতন ছিল না। যখন সচেতন হলো তখন তিন বছর বা পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচন কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে এল। বাকী সময়টা ঘুমিয়ে থাকল। অতন্দ্র প্রহরী যারা হতে পারতেন তাঁরাও দ্বিধায় জর্জর। ইংলণ্ড যেহেতু পুঁজিবাদী দেশ সেহেতু তার পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রটাই পুঁজিবাদের মতোই পরিত্যাজ্য। পুঁজিবাদের থেকে তাকে আলাদা করে দেখতে তাঁরা নারাজ। কিছুতেই তাঁদের বোঝানো যাবে না যে একটা দেশের সব কিছু খারাপ নয়। যেটা ভালো সেইটেই ইংরেজরা আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা যদি ভুলে যাই তো ক্ষতিটা ওদের নয়, আমাদেরই। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা সমাজতন্ত্রী ভাবুক। আর একদল আছেন যাঁরা জাতীয়তাবাদী। ইংলণ্ড পুঁজিবাদী বলে নয়, সাম্রাজ্যবাদী বলেই তাঁদের চক্ষুঃশূল। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে যেটা ভালো তাঁদের পক্ষে সেটা মন্দ। ইংলণ্ডের কাছ থেকে তাঁদের শেখবার কিছু নেই। তার অধীনে থেকে দুটো শতাব্দী বৃথা কেটেছে।

এমনি করে আমরা হারিয়ে ফেলেছি আমাদের মৌল অধিকার। সেকালের ভাষায় যার নাম চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ। চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা। পুরুষত্ব যেমন পুরুষের, পুরুষার্থ তেমনি নাগরিকের। ওটা হারালে আর থাকে কী?

আত্মিক অস্বস্তি

আপনার পরামর্শে যাঁরা সেদিন লেখা চাইতে এসেছিলেন তাঁদের বললুম, "আমার দেহ অসুস্থ, আমার মন অসুস্থ, আমার আত্মা অসুস্থ। এ অবস্থায় কী-ই বা লিখতে পারি!" কথাটা ভেবেচিন্তে বলা হয়নি। ভেবেচিন্তে বললে এইরকম হতো, "আমার দেহ অসুস্থ, আমার মন অশান্ত, আমার আত্মায় অস্বস্তি।"

আমার দেহের অসুস্থতা বহুদিন লেগে রয়েছে। তা সত্ত্বেও লিখে চলেছি। ডাক্তারের বারণ মানছিনে। আর মানসিক অশান্তি বলতে যদি বুঝতে হয় পুত্রকন্যার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পিতার উদ্বেগ তা হলে এটাও বহুদিনের। কিন্তু যেটা আমার হাত চেপে ধরেছে সেটা আমার ব্যক্তিগত ঘরোয়া ব্যাপার নয়, সেটা আপনার, আমার ও আর-সব ইনটেলেকচুয়ালের জীবন মরণের ব্যাপার।

ইউরোপে ভলতেয়ারের যুগ থেকে আর ভারতে রামমোহনের আমল থেকে সমাজের একটি অংশকে প্রথমে চার্চের কর্তৃত্ব হতে ও পরে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হতে কতক পরিমাণে মুক্তি অর্জন করে নিতে হয়েছে। এই অংশটির নাম রাখা হয়েছে ইনটেলেকচুয়াল। ইংরেজ শাসকরাও এঁদের সমীহ করে চলতেন। কখনো আমাকে আদেশ দেওয়া হয়নি যে আমার লেখা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করার পূর্বে কোনো একজন সরকারী কর্মচারীকে দেখিয়ে নিতে হবে ও তিনি ইচ্ছামতো বাদসাদ দিতে পারবেন। তবে নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নাটকটাকে পুলিশের জিম্মায় দিতে হতো, তারা খুশিমতো কাটাকুটি করত আর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনারের সামনে পেশ করত। সে

যে কী মজার ব্যাপার তা এখনো আমার মনে আছে। তখন আমি নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। নাট্যকার তখন মৃত, নইলে তিনি মরণযন্ত্রণা ভোগ করতেন। আমি এখনো জীবিত, কেন সাধ করে মরণযন্ত্রণা ডেকে আনি! আমি এখন নীরব দর্শক।

ইনটেলেকচুয়ালরা নীরব দর্শক হলে সমাজের লাভ যা হয় তার চেয়ে ক্ষতি হয় অনেক বেশী। কারণ তাঁরাই তো সমাজের চোখ কান। যে সমাজে ইনটেলেকচুয়ালরা নীরব দর্শক সে সমাজ সমৃদ্ধ হতে পারে, শক্তিমান হতে পারে, জ্ঞানবানও হতে পারে, কিন্তু সে সমাজ অন্ধের দ্বারা নীয়মাণ অন্ধের সমষ্টি আর বধিরের দ্বারা নীয়মাণ বধিরের সমবায়। তার মঙ্গল অমঙ্গলের জন্যে আপনার আমার মতো লেখকেরও দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব আছে বলেই দায়িত্বের অনুপাতে ক্ষমতাও চাই। ক্ষমতা না থাকলে দায়িত্ব থাকা না থাকা সমান অর্থহীন। অন্ধের আবার দায়িত্ব কিসের! বধিরের আবার দায়িত্ব কিসের! অথচ আমরা জানি আমাদের দায়িত্ব আছে ও দেশের কাছে এর জবাবদিহিও আছে। ইতিহাস জানতে চাইবে এই সঙ্কটে আমরা কে কী করেছিলুম।

এবার আসি আত্মার অস্বস্তির কথায়। এমনি অস্বস্তি বোধ করেছিলুম ত্রিশ বছর আগে, ১৯৪৬-৪৭ সালে। অন্তর তখন এক অনির্দেশ্য আশঙ্কায় ভরা। কোনো রকম সমাধানই কোনো পক্ষ স্বীকার করছেন না। কী যে হতে যাচ্ছে কেউ বুঝতে পারছেন না। না ইংরেজ, না কংগ্রেস, না মুসলিম লীগ, না গান্ধী, না জিন্না। যে দিকে তাকাই সেদিকেই দেখি গৃহযুদ্ধের আয়োজন। গৃহযুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা যে সেটাতে জড়িয়ে পড়বে না সেটাও স্পষ্ট হয় কলকাতা দাঙ্গার সময় তাদের নিরপেক্ষ নিষ্ক্রিয়তায়। আমার আত্মার সেই অস্বস্তি আজ এতদিন বাদে দ্বিতীয়বার অনুভব করছি। আর ভাবছি অপরং কিম্ বা ভবিষ্যতি! দেশ ভাগ হয়ে যাবে না, তেমন কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু আশঙ্কা কি সেটাই একমাত্র? আমার অন্তর এক অনির্দেশ্য ও অপ্রকাশ্য অস্বস্তিতে পূর্ণ। অন্ধকারে হুইসল দিয়ে বগল বাজানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেবারকার অস্বস্তিটা ছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এবার-কার অস্বস্তিটা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ইণ্ডিয়া বলতে যাকে বোঝাত তার মূলে সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু থেকেই হিন্দু, সিন্ধু থেকেই

ইণ্ডিয়ান। ইণ্ডিয়া থেকে যেমন সিন্ধুকে স্বতন্ত্র করা যায় না তেমনি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমকেও। এ কেমনতর ইণ্ডিয়ান নেশন যার অবিভাজ্য অঙ্গ নয় হিন্দু মুসলমান শিখ? যার থেকে অধিকাংশ মুসলমান পড়েছে বাদ? ইংরেজদের ভারতীয় সাম্রাজ্য আর ভারতীয়দের স্বাধীন নেশন যে ভূগোলের দিক থেকে ও ইতিহাসের দিক থেকে এক নয় এটা উপলব্ধি করতে আমার দীর্ঘকাল লেগে গেল। এখন আবার এক নতুন উপলব্ধির জন্যে আত্মাকে প্রস্তুত করতে হচ্ছে। বেদনাবহ এ প্রস্তুতি।

আমাদের সংবিধান সভার সদস্যরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুরূপ একটা ভারতীয় পার্লামেন্ট সংস্থাপন করলেও তাকে একজিকিউটিভ ও জুডিসিয়ারির উপর সোভরেন পাওয়ার দিয়ে যাননি। তবে দিয়ে গেছেন তাকে সংবিধান সংশোধনের অধিকার। দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সংবিধান সংশোধন করতে করতে কি সংবিধানের মূল কাঠামোটাকেই বদলে দিতে বা রদ করতে পারা যাবে? পার্লামেন্ট কি সংবিধান সভার মতো সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী?

পাঁচ বছর ধরে কাজ করে দেখা গেল একজিকিউটিভের সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বাধছে না, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিরোধ বাধছে কেবল জুডিসিয়ারির সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে অনির্বাচিত বিচারপতিরাই স্বয়ম্ভূ। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যদি এক পথে চলেন তো অনির্বাচিত বিচারপতিরা চলেন আরেক মার্গে। হয়তো বিপরীত মার্গে। এতে বিচারপতিদের কিছু আসে যায় না, আসে যায় পার্লামেন্টের। আসে যায় একজিকিউটিভের। বিচারপতিদের পথে আনতে না পারলে তাঁরা হয়তো পদে পদে বাধা দেবেন। অপরপক্ষে বিচারপতিদের যদি পথে আনা যায় তবে নিরপেক্ষ জুডিসিয়ারি বলতে কিছু থাকে না। সেটাও হয় কংগ্রেসেরই একটা বাহন। আর কংগ্রেসই তো এদেশের সর্বপ্রধান দল। বলতে গেলে একচ্ছত্র দল। যদি কেউ কংগ্রেসের দিক থেকে বিবেচনা করেন তা হলে সংবিধানের মূল কাঠামো রদবদল করা তাঁর মতে একান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার। কিন্তু দেশে যদি হঠাৎ একটা বিপর্যয় ঘটে, অন্য কোনো দলের হাতে বা কর্ণেলদের হাতে যদি একজিউকিটিভ পাওয়ার আসে তা হলে পার্লামেন্টকে সোভরেন করলে তারাই সোভরেন হবে।

কথা উঠেছে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যেমন সোভরেন তেমনি সোভরেন হবে ইণ্ডিয়ান পার্লামেন্ট, এটাই তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীর মূলতত্ত্ব। এখানে

আমার কিছু বক্তব্য আছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে কার্যত সোভরেন এটা আমিও মানি। এটা সত্য। অথচ ব্রিটেনের সোভরেন হাজার বছর আগে যিনি ছিলেন এখনো তিনিই। অর্থাৎ সে দেশের রাজা বা রাজ্ঞী। যখন যিনি সিংহাসনারূঢ়। সোভরেন বলতে ওদের ভাষায় রাজাকে বা রাজা না থাকলে রানীকেই বোঝায়। তিনি ক্ষমতাসীন না হলেও ঠুঁটো জগন্নাথ নন। তিনি ইচ্ছা করলে প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন, পার্লামেণ্টকে ভেঙে দিতে পারেন। তবে তিনি ভালো করেই জানেন যে সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করলে জনসাধারণ বিদ্রোহ করবে। আর নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে আবার সেই প্রধানমন্ত্রী ও সেই পার্লামেণ্টই ফিরে আসতে পারে। ফিরে এসে রাজাকেও সিংহাসনচ্যুত করতে পারে। জনমতের নাড়ী না টিপে রাজা বা রাজ্ঞী কখনো অমন কাণ্ড বাধাতে পারেন না। কিন্তু কে জানে এমন এক পরিস্থিতিও তো উদয় হতে পারে যখন জনমত রাজার বা রাজ্ঞীর পেছনেই দাঁড়াবে। কিংবা দু'ভাগ হয়ে যাবে। তার মানে গৃহযুদ্ধ। ইংলণ্ডের সংবিধান লিখিত সংবিধান নয়। ইংরেজরা তাই গোড়া ঘেঁষে সংশোধন করে না। তাদের রাজা যে সোভরেন তার আরও একটা প্রমাণ, 'The King can do no wrong.'' রাজা যদি দণ্ডনীয় অপরাধও করেন তাঁকে ওরা আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে না। সিংহাসনচ্যুত করবে। কিন্তু দণ্ডনীয় অপরাধ করলে প্রধানমন্ত্রীকেও বা পার্লামেণ্টের স্পীকারকেও রাজদ্বারে দাঁড়াতে হবে। তা হলে কোন্ জন সোভরেন? ইংরেজরা প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের একটা সন্ধি ঘটিয়েছে। তাই ইংলণ্ড যদিও কার্যকালে পার্লামেণ্টকে সোভরেন করেছে তবু রাজাকেও তাঁর উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত সোভরেনটি থেকে বঞ্চিত করেনি। আর বিচারপতিদের আনুগত্য রাজার কাছেই। প্রিভি কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির সভ্যরা যখন রায় দেন তখন তার শেষ বাক্যটি হলো, "আমরা বিনম্রভাবে হিজ ম্যাজেষ্টিকে এই পরামর্শই দেব।" বলা বাহুল্য হিজ ম্যাজেষ্টি সেই পরামর্শের দ্বারাই চালিত হবেন। শালগ্রামের যেমন শোওয়া আর বসা।

ইংলণ্ডের পুরো সীস্টেমটাকে আমদানী করা বা নকল করা সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। সকলেই এটা জানে ও মানে, তবু যখনি মুশকিলে পড়ে তখনি বলে ইংলণ্ডের যখন ঐ রীতি তখন আমাদেরও হবে সোভরেন পার্লামেণ্ট আর সেই সোভরেনের অধীনস্থ জুডিসিয়ারি। তারপরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী

হবেন রাজদণ্ডের ঊর্ধ্বে। সেইসঙ্গে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর স্পীকারও। এটা কিন্তু ইংলণ্ডের রীতি নয়। ইংরেজরা কখনো স্বীকার করবে না যে পার্লামেন্টের এ ক্ষমতা আছে বা সংবিধান সংশোধনের ফলে বর্তাবে। আমাদের পাঁঠা আমরা যেমন খুশি কাটতে পারি, কিন্তু একথা আমাদের মুখে সাজে না যে এটাই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী। আর আমাদের মুখে সাজলেও দুনিয়ার চোখে সইবে কেন? তারা সমালোচনা করবে। তখন আমরা বলব, "দেখছ তো, ওরা কেমন হিংসুটে। আমাদের ভালো দেখতে পারে না।"

'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে' সেই যে একটা বেড়ালের গল্প আছে সে বেড়ালটা যখন মিলিয়ে যায় তার মুখের হাসিটি তখনো শূন্যে লেগে থাকে। আমাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও কি একদিন হবে তেমনি এক Cheshire cat? আমাদের চোখের সামনেই মিলিয়ে যাবে, রেখে যাবে একটা অশরীরী হাসি? বলা যায় না। এই জন্যেই আমার আত্মিক অস্বস্তি। সেবার মিলিয়ে গেল অবিভক্ত ভারতীয় জাতীয়তা, অবিভক্ত বঙ্গীয় প্রজাতীয়তা। রেখে গেল একটা স্বপ্ন। আমাদের জীবনে আমরা সে স্বপ্নের পরিপূরণ দেখে যেতে পারব না। আরো পঞ্চাশ বছর বাঁচলেও না। অবিভক্তকে বিভক্ত করতে তিনটে মাসও লাগল না। বিভক্তকে অবিভক্ত করতে তিন বছর লাগবে ভেবেছিলুম। ত্রিশ বছরেও তার লক্ষণ দেখতে পাইনি। বরং তার উল্টোটাই দেখি। যদি কেউ মনে করে থাকেন যে আজকের দিনের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী প্রস্তাবিত সংশোধনের পরও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীই থাকবে বা কালক্রমে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে তা হলে তাঁকে আমি বলব যে, চেশায়ার ক্যাট একবার মিলিয়ে গেলে তার হাসিটাকেই চেশায়ার ক্যাট বলে কল্পনা করে সুখ নেই। তাকে আবার মূর্তিমন্ত করাও কোনো যাদুকরের সাধ্য নয়। ইংরেজ গেছে, সেইসঙ্গে অবিভক্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদও গেছে, অবিভক্ত বঙ্গীয় প্রজাতীয়তাবাদও। সেইসঙ্গে না হলেও তার ত্রিশ বছর বাদে যাই-যাই করছে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী নামক ব্রিটিশ পণ্য। এখন লোকে চায় খাঁটি স্বদেশী শিল্প। যা তৈরী হতো হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, মৈশুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে।

দেশীয় রাজ্যে আমার জন্ম। তার গুণাগুণ আমার ভালো করেই জানা।

মহানুভব রাজা মহারাজা আমি স্বচক্ষে দেখেছি বা তাঁর কথা লোকমুখে শুনেছি। রাজতন্ত্র যে হাজার হাজার বছর স্থায়ী হয়েছিল তার কারণ মাঝে মাঝে এক একজন মহানুভব রাজা মহারাজা আসতেন আর প্রজাদের অন্তর জয় করে যেতেন। কিন্তু এর ফলে লোকের মনোভাবটা হতো নাবালকের মতো। যা করবার তা বাবাই করবেন। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা বাবাই নেবেন। বাপের উপর যদি কেউ ষাট সত্তর বছর বয়সেও নির্ভর হয় তবে তাকে কখনো সাবালক বলতে পারা যায় না। সে চির নাবালক। এখন পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর মূলতত্ত্ব হলো আঠারো বছর বা একুশ বছর বয়স হলেই প্রত্যেকে সাবালক। সে তার ইচ্ছামতো ভোট দিতে অর্থাৎ মত দিতে পারে। সেইভাবে দেশের শাসক নির্বাচন করতে পারে। শাসকরা কোন্ নীতি অবলম্বন করবেন তার নির্দেশ দিতে পারে। কার্যত অবশ্য তার উল্টোটি হয়। নেতারাই নাচান, লোকে নাচে। তারাই কানে মন্ত্র দেন, তারা চোখ বুজে ভোট দেয়। তা হলেও এই পদ্ধতির মূল্য আছে। না থাকলে আমাদের দেশীয় রাজ্যের রাজারা আমাদের মতো প্রজাদের দুয়ারে এসে ভোট ভিক্ষা করতেন না। আমরাই এতকাল তাঁদের দুয়ারে গিয়ে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে এসেছি। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী এসে এমন ওলটপালট করে দিল যে রাজা এসে প্রজার কুটীরে হাজির। রানী তো থাকতেন অন্তঃপুরে। তিনি অসূর্যম্পশ্যা। এখন সকলেই তাঁর মুখ দেখতে পায়।

এই যে পটপরিবর্তনটা ঘটে গেল এটা কি ভালোর জন্যে নয়? কিন্তু একদিন হয়তো উপলব্ধি করব যে আমি আছি বটে, কিন্তু আমার অস্তিত্বের মূল্য নেই, কারণ আমার মতামতের মূল্য নেই, আমি কথাটি বলতে পারব না, বলতে চাইলে তার আগে রাজপুরীর দ্বারস্থ হতে হবে। আমি যা বলব তার কোনো নিজস্ব মূল্য থাকবে কি না সেটা ছিল এতদিন সাধারণের বিচার। হয়তো আমার বিরুদ্ধেই যেত। আমার লেখা অপাঠ্য বলে অবিক্রীত পড়ে থাকত। কিন্তু সাধারণ পাঠককেও মনে করা হচ্ছে নাবালক। আমার লেখা পড়ে তাদের মতিগতি বিগড়ে যেতে পারে বলে মাঝখানে একজন অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি আবার আমারও অভিভাবক। আমি কী বলব না বলব তিনিই স্থির করবেন। এর নাম যদি পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী হয় তবে এতদিন এর সঙ্গে পরিচিত ছিলুম না। পরিচিত হয়ে শঙ্কিত হচ্ছি।

এটা এক-আধ বছর স্থায়ী হলে আতঙ্কের কারণ হতো না, চিরস্থায়ী হলে দেশশুদ্ধ লোক চির নাবালক হতে বাধ্য। দেশশুদ্ধ লেখকও তাই।

ছেলেবেলার আমার প্রিয় গান ছিল, "এই দেশেতেই জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।" এখন কি আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হবে, "দেশীয় রাজ্যেই জন্ম, যেন দেশীয় রাজ্যেই মরি?" না, ঢেঙ্কানাল নয়, ভারত এর নাম। রাজন্যরা নেই, নতুন এক রাজন্য শ্রেণীর বীজ বপনকার্য চলেছে। তাঁদেরই অনুমোদিত লেখা পড়তে হবে, তাঁদেরই অনুমোদিত লেখা ছাপতে হবে, তাঁদেরই অনুমোদিত ভাবনা ভাবতে হবে, তাঁদেরই অনুমোদিত তত্ত্ব বিশ্বাস করতে হবে, তাঁদেরই অনুমোদিত বিবেচনায় রায় দিতে হবে। এককথায় তাঁদেরই অনুমোদন নিয়ে বাঁচতে হবে। কেবল মরণের বেলাই আমি স্বাধীন। স্বাধীনতা আমার জন্মস্বত্ব নয়, মরণস্বত্ব।

(শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্র)

আমরা কি তবে তলিয়ে যাব

অতীতের দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন রাজা। সারা পৃথিবী জুড়ে এই ছিল নিয়ম। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে এর কিছু ব্যতিক্রমও ঘটত, যেমন প্রাচীন গ্রীসে। কিন্তু সেটাকে কেউ চিরস্থায়ী বলে মেনে নিত না। রাজতন্ত্রই ছিল সব দেশের সনাতন সংবিধান।

সর্বময় ক্ষমতা কেমন করে রাজশক্তির হাত থেকে প্রজাশক্তির হাতে আসবে এ নিয়ে গত কয়েক শতাব্দীর অগ্রগামী মনীষীরা চিন্তিত ও বিদ্রোহীরা সক্রিয়। যেখানেই তাঁরা সফল হয়েছেন সেখানেই তাঁদের সাফল্যকে পাকা করার জন্যে একটি সংবিধানও প্রণয়ন করা হয়েছে। নয়তো তাঁদের সাফল্য কাঁচা থেকে যেত। সংবিধান কাঁচাকে পাকা করে। ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ী করে। এইখানেই তার মূল্য। নতুবা সংবিধান প্রণয়ন না করলেও রাজশক্তির হাত থেকে প্রজাশক্তির হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো যায়।

মহাত্মা গান্ধীও ক্ষমতার হস্তান্তরের কথাই ভেবেছিলেন, সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবেন নি। পরে যখন ভাবতে আরম্ভ করেন তখন যে লাইনে ভাবেন তা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ স্বীকার করেন না। মুসলিম লীগকে পাকিস্তান ছেড়ে দেবার পর বাকী স্থানের জন্যে সংবিধান রচনার সময় যখন আসে তখন কংগ্রেস সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেয় প্রজাশক্তির হাতে। প্রজারাই তখন থেকে ভারত রাষ্ট্রের সোভরেন। তখন থেকে তারা আর প্রজা নয়, তারা নাগরিক। আমার পাশপোর্টে আগেকার দিনে লেখা ছিল ব্রিটিশ সাবজেক্ট। পরবর্তীকালে লেখা হলো সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া। প্রত্যেকের বেলা তাই। কেউ কারো চেয়ে কম অধিকারী বা বেশী অধিকারী নয়।

প্রত্যেকেরই ভোট আছে, যদি না নাবালক হয়, অথবা অন্য কোনো কারণে ভোটদানের অযোগ্য হয়।

আমাদের সংবিধানের প্রথম কথাই হলো আমরা সবাই মিলে ক্ষমতার মালিক কিন্তু রাষ্ট্র তো সবাই মিলে চালাতে পারে না। সেইজন্য পাঁচ বছর অন্তর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়ে যায় সরকার গঠন করবে কোন্ দল। যেক্ষেত্রে কোনো একটি দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই সেক্ষেত্রে একাধিক দল মিলে সরকার গঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে সরকারের পতন হয়। মারামারি কাটাকাটি না করে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানোর এই হলো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়। যে ব্যাপার পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে বার বার ঘটেছে সে ব্যাপার ভারত রাষ্ট্রে একবারও ঘটেনি। অথচ আমরা কত না সম্প্রদায়ে কত না জাতে কত না ভাষাগোষ্ঠীতে কত না আঞ্চলিক ভগ্নাংশে বিভক্ত। ভারতের সংবিধান একটা বিস্ময়।

তা হলেও স্বীকার করতে হবে যে এটা একটা রাজনৈতিক সংবিধান। ক্ষমতা নামক অস্বিষ্টকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই এর লক্ষ্য। তা ছাড়া আরো একটি অস্বিষ্ট আছে। তার নাম ধনসম্পদ। ধনসম্পদ যদি শতকরা দশজনের মুঠোর মধ্যেই থেকে যায়, বাকী নব্বইজন যদি তাদের দ্বারা বঞ্চিত বা শোষিত হয়, তা হলে প্রজাশক্তির হাতে সর্বময় ক্ষমতা এসেছে বলে যতই আওয়াজ করি না কেন সেটা সেই নব্বইজনের কানে ফাঁকা আওয়াজ। সমাজ যেমন শ্রেণীবদ্ধ ছিল তেমনি শ্রেণীবদ্ধ রয়ে গেল। উপরের দিকে যারা ছিল তারাই রয়ে গেল উপরের দিকে। নিচের দিকে যারা ছিল তাদের জায়গা রয়ে গেল নিচেই। এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করাই কি সংবিধান প্রণেতাদের অভিপ্রায়? তাই যদি হয়ে থাকে তবে শতকরা নব্বই জনের কাছে এ সংবিধান অর্থবহ নয়। একে রক্ষা করার জন্যে তারা কেউ প্রাণ বিসর্জন দেবে না। বরঞ্চ একেই বিসর্জন দেবে। তাতে যদি কিছু সুরাহা হয়। সমাজতন্ত্র হচ্ছে শ্রেণীশূন্য সমাজ। তার জন্যে চাই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি। মরণের জন্যে প্রস্তুতিও তার অঙ্গ।

রাজনৈতিক সংবিধান যে যথেষ্ট নয় একথা আমিও উপলব্ধি করেছি। সেটা সংবিধান রচনার পূর্ব হতেই। নানা দেশের সংবিধান নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি মেক্সিকোর সংবিধানে নাগরিকদের প্রত্যেকের রুজি রোজগারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট সংবিধানে তো সেটা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের সংবিধানে সে রকম কিছু থাকলে তো ভালোই হয়। এই ছিল

আমার তৎকালীন চিন্তা। কিন্তু সংবিধানটা এমনিতেই একখানা অষ্টাদশপর্ব মহাভারত। সেটাকে আরো ভারাক্রান্ত করতে নেতারা নারাজ। ও রকম একটা অঙ্গীকার কার্যত পালন করা কি সহজ কথা? প্রাথমিক শিক্ষার বিধান দিয়েও কি সর্বসাধারণকে সেটুকু দিতে পারা গেছে? বস্তুত সেটা সে সময় কাজের কথা ছিল না। ঐ যে বলে, প্রথম জিনিসগুলো প্রথমে। আমাদের সংবিধান সেই নীতি অনুসারে সংরচিত।

ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে। এখন আবার আমরা ভাবতে শুরু করেছি যে রাজনৈতিকের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ নৈতিক বিধিবিধানও থাকা উচিত। কেবলমাত্র একটা ভোট ধরিয়ে দিলে কী হবে, যদি না ঘরে ভাত থাকে, পরণে কাপড় না থাকে, মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকে, অসুখ করলে ওষুধ না থাকে, বেকার হলে ভাতা না থাকে বা কাজ না থাকে। আজকালকার দিনে সমাজতন্ত্রী বলে নিজেকে ঘোষণা না করলেও বহু দেশ সর্বসাধারণের জন্যে রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করেছে। সংবিধানে এমন কোনো বিধিবিধান না রেখেও পার্লামেন্টে আইন পাশ করিয়ে এ সব সংসাধিত হয়েছে। ভারতে এসব যদি আজ এখুনি হয় আমিই সবচেয়ে আনন্দিত হব। এর জন্যে যদি সংবিধান সংশোধন করতে হয় আমি বলব, আলবৎ। আমার তো মনে হয় না বিচারপতি বা বুদ্ধিজীবী মহল এবিষয়ে ভিন্নমত হবেন। সরকারের যাঁরা বিরোধীপক্ষ তাঁদের মনে কী আছে জানিনে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তাঁরা বাধা দেবেন না। বাধা দিতে সাহস পাবেন না। ভোটের জন্যে আবার তো সাধারণ নাগরিকদের দুয়ারে দুয়ারে যেতে হবে।

কিন্তু সংবিধানটাকে যেভাবে সংশোধন করা হলো সেটা অভাবনীয়। রাতারাতি পাশ হয়ে গেল ৫৯টা সংশোধক প্রস্তাব। তার জন্যে আমাদের ৫৯টা দিনও ভাবতে দেওয়া হলো না। দিল্লী থেকে কলকাতায় খসড়া বিল এসে পৌছয় একখানা কি দু'খানা। তা নইলে খবরের কাগজে যেটুকু বেরোয় সেইটুকুই আমাদের পড়া। এমন তড়িঘড়ি আর এমন চুপি চুপি একটা সাধারণ আইনও পাশ হয় না। পার্লামেন্টের সদস্যরাও যে পুরোপুরি বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছেন তাও মনে হয় না। তাঁদের দলপতিরা তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁরা সে নির্দেশ অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। একই দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায়। একদিন শোনা যাবে সংশোধন পেয়েছে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন।

যতটুকু আমি বুঝি এটাও সেই ক্ষমতার রাজনীতির সংবিধান। ধনসম্পদের অর্থনীতির নয়। ভূমির মালিকানা, অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে আসেনি। কবে আসবে কেউ জানে না। আদৌ আসবে কি না তাও কেউ জোর করে বলতে পারে না। কেমন করে আসবে তাও অনিশ্চিত। উপরে একটা লেবেল এঁটে দেওয়া হচ্ছে 'সমাজতন্ত্র'। সে লেবেল তো হিটলারের নাৎসী পার্টির গায়েও আঁটা ছিল। নাৎসী বলতে বোঝায় জাতীয় সমাজতন্ত্রী।

যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। যা কিছু সমাজতন্ত্রী বলে চালিয়ে দেওয়া হয় তাই সমাজতন্ত্রসম্মত নয়। উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় সব কিছু রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনতে হবে। তাও পাঁচ দশ বছরের মধ্যে যাতে সাধারণ লোক সমাজতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। যাতে শতকরা নব্বই জনের দুরবস্থা দূর হয়। কাইজারের রাজত্বে বিসমার্কও জার্মান শ্রমিকদের জন্যে কয়েক রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রের বিরোধী।

ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দল যে সমাজতন্ত্রী নয় সকলেই জানে একথা। তবু তারাও মেনে নিয়েছে লেবার পার্টির প্রবর্তিত সমাজকল্যাণ ব্যবস্থা। তাতে ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হয়নি, কাটা গেছে কয়েকটা ডালপালা। লেবার পার্টিও কি মূলোচ্ছেদ করতে চায় নাকি? শ্রমিকদের মনের কথাটা এই যে, ধনতন্ত্র থেকে লাভ যেটা হয় সেটার বৃহত্তর অংশটা ধনীদের পাতে না পড়ে শ্রমীদের পাতে পড়ুক। অর্থাৎ ধনতন্ত্র থাকুক, ভাগ বাঁটোয়ারাটা রাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের প্রতি আরো অনুকূল হোক।

ইকনমিটা ক্যাপিটালিস্ট থাকবে, সোশিয়ালিস্ট হবে না, শুধু কেকখানাকে এমনভাবে কাটতে হবে যে শ্রমিকদের ভাগে পড়ে তার বৃহত্তর খণ্ডটা, এরই নাম বিলেতের লেবার পার্টির সমাজতন্ত্র। গণতন্ত্রের সঙ্গে এটা দিব্যি খাপ খায়। এর জন্যে গণতন্ত্রের বিলোপ বিলেতের সমাজতন্ত্রীরা চায় না। বলতে গেলে পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্রী বলে পরিচিত কোনো দলই চায় না। এমন কি, পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিস্ট শিবিরেও দ্বিতীয় চিন্তন আরম্ভ হয়ে গেছে। মনের কথাটা এই যে, ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে শ্রমিকরা এমন কিছু লাভবান হবে না। শ্রমিকরা যদি সওয়ার হয়ে পিঠে চেপে বসে তাহলে ঘোড়াটা ধনতন্ত্রই থেকে যাক। আর গণতন্ত্রের বেলায় যদি কমিউনিস্টরাই

জেতে তাহলে খেলার নিয়মটা পালটানোর দরকার আছে কি? যেমন দেখা যাচ্ছে ইটালীতে কমিউনিস্টরাই সংখ্যাগুরু হবে। ফ্রান্সে সোশিয়ালিস্ট আর কমিউনিস্ট যদি হাত মেলায় তবে তারাই পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা। বলা বাহুল্য তারা কেউ গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করতে অধীর নয়। উদ্দেশ্যটা ক্ষমতার আসনে বসা ও ধনসম্পদ ভাগ করে ভোগ করা। উদ্দেশ্য সিদ্ধিটাই আসল।

ইকনমিটা সোশিয়ালিস্ট হবে এটা যাদের লক্ষ্য তারা সরাসরি বিপ্লববাদী। তারা রক্তাক্ত বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যাবে ও বেঁচে থাকলে খেলার নিময়টাই পালটে দেবে। ধনিক আর শ্রমিকের সহাবস্থানে তারা বিশ্বাস করে না। ধনতন্ত্রকে জিইয়ে রাখে যে গণতন্ত্র সে গণতন্ত্র তাদের মতে ঝুটা গণতন্ত্র। সত্যিকার গণতন্ত্র তখনি সম্ভব হবে যখন ধনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও নিহত ও নিশ্চিহ্ন হবে। একটা বিপ্লবে যদি কাজ না হয় তবে বার বার বিপ্লব ঘটাতে হবে। পার্লামেণ্টারি নির্বাচনের নাম বিপ্লব নয়। পার্লামেণ্টারি সংবিধান বা তার সংশোধন কখনো ধনতন্ত্রের তিরোধান চায় না। তেমন গণতন্ত্রের সঙ্গে সত্যিকার সমাজতন্ত্র কখনো খাপ খেতে পারে না। ধনতন্ত্রের গোড়ায় কোপ মারতে গেলে যদি গণতন্ত্রের গোড়াতেও কোপ লাগে তো গণতন্ত্র নিপাত যাক। পরে আবার নতুন করে গজাবে। তখনি সেটা হবে প্রকৃত গণতন্ত্র।

সাম্রাজ্যবাদ এদেশ থেকে বিদায় নিলেও ধনতন্ত্রবাদ বিদায় নেয়নি। বড়ো বড়ো কোম্পানীগুলো হাত বদল করে বা হাতে হাত মিলিয়ে এখন জাতীয়তাবাদী বনে গেছে। আরো অনেক কোম্পানী ভুঁই ফুড়ে উঠেছে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় মহীরুহ হয়েছে। ভারতের পাবলিক সেকটরটিও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে, কিন্তু প্রাইভেট সেকটরটাই বয়োবৃদ্ধ তথা জ্ঞানবৃদ্ধ। রাজনৈতিক দলগুলোর কোষাগার তো তারই দানপুষ্ট। সেই কামধেনুটি বশিষ্ঠের হবে না বিশ্বামিত্রের হবে এই তো আমাদের 'অর্থনৈতিক চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা। ক্যাপিটালিস্ট ইকনমিকে সমূলে বিনষ্ট করে সোশিয়ালিস্ট ইকনমির বৃক্ষরোপণ জাতীয়তাবাদী দলগুলির একটিরও কল্পনায় নেই। সাম্যবাদী দলগুলি মুখে বলে বটে ওকথা, কিন্তু তাদের মনের কথা হলো, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

ধনতান্ত্রিক ইকনমিকে বাঁচতে দিয়ে বাড়তে দিয়ে সমাজতন্ত্রী ইকনমি তার স্থান নিতে পারে না। শূন্যতা যেখানে নেই পূরণও সেখানে নেই। কতকগুলো

কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করাই সোশিয়ালিস্ট ইকনমি নয়। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও পশ্চিম জার্মানীতে বিস্তর প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ ইতিমধ্যে পাবলিক এণ্টারপ্রাইজ হয়েছে। এদেশেও হয়েছে, আরো হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ধনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদকারী নয়। অন্য প্রক্রিয়ার জন্যে কেউ প্রস্তুত নয়।

এই যে দেশের অবস্থা সে দেশে হঠাৎ সাত তাড়াতাড়ি সংবিধান সংশোধন হয় কেন? হয় যদি তো এমন ঝাড়ে মূলে হয় কেন? একসঙ্গে ৫৯টা সংশোধন। আমি এখনো কাগজপত্র পাইনি, সব কিছু পড়ে দেখিনি। মোটামুটি এইপর্যন্ত বুঝি যে পার্লামেণ্টকে ১৯৫০ সালের সংবিধানে সোভরেনটি অর্থাৎ সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, সুতরাং ১৯৭৬ সালে তাকে সর্বশক্তিমান করতে হবে। এতে বাধা দিচ্ছে কে? দিচ্ছে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট। করতে হবে তাদের গর্ব খর্ব। পার্লামেণ্ট যা-ই বলবে তা-ই বেদবাক্য, যা-ই করবে তাই শিরোধার্য। বাইরে পার্লামেণ্ট যদিও আপনাকে সর্বশক্তিমান বলে জাহির করছে কার্যত পার্লামেণ্ট হচ্ছে মন্ত্রীপরিষদ্ বা একজিকিউটিভের আজ্ঞাবহ। তার যেটুকু স্বাতন্ত্র্য সেটুকু শুধু বিরোধী দলের ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতায় নিবদ্ধ।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পার্লামেণ্ট নয়, মন্ত্রিসভা বা একজিকিউটিভই এই ছাব্বিশ বছর পরে সোভরেন্টি করায়ত্ত করল। আর এক নম্বর অন্তরায় জুডিশিয়ারি। তাকে সে পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে অবনমিত করেছে। দু'নম্বর অন্তরায় রাষ্ট্রপতি। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি কনভেনশন অনুসারে তিনি কখনো মন্ত্রিমণ্ডলীর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু ইচ্ছা করলে তিনি আপত্তি জানাতে পারেন, ভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন, দেরি করিয়ে দিতে পারেন। এখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি কনভেনশন গেল। তিনি আর উচ্চবাচ্য না করে অবিলম্বে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্তে সায় দেবেন। নয়তো বলবেন, 'ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি।' পদত্যাগ করবেন।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার পর বাকী থাকে আরো এক পাখী। তার নাম প্রেস। যদিও ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটগুলো যেমনকে তেমন থেকে যাচ্ছে তবু তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একপ্রস্থ ডাইরেকটিভ প্রিন্‌সিপল্। সেইসূত্রে প্রবেশ করবে প্রেসের উপর কড়া পাহারা। সংবিধানের নবম তফশীলে প্রেসের স্বাধীনতার পরিপন্থী একটি আইনকে ইতিমধ্যেই কায়েম করা হয়েছে। লেখক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, সম্পাদক সকলেই প্রহরাধীন। কার

ঘাড়ে ক'টা মাথা কে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবে। যদিও সেটা তার মৌল অধিকার।

গণতন্ত্রের উপর অঙ্কুশের কাজ করে জুডিসিয়ারি, কাজ করে প্রেস, কাজ করেন পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে শাসিত দেশের রাষ্ট্রপতি। এক এক করে প্রত্যেকটি অঙ্কুশকে কণ্টকের মতো সরালে যেটা থাকবে সেটা নিরঙ্কুশ ও নিষ্কণ্টক একজিকিউটিভ। আর তার বশংবদ পার্লামেণ্ট। ক্ষমতার এতখানি কেন্দ্রীকরণ কি ভালো! আরো খারাপ হবে যখন ধনসম্পদও একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হবে। সোভিয়েট রাশিয়া বা গণচীনের মতো।

পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া আর সারা দেশের নাগরিকদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি পাওয়া একই জিনিস নয়। সাধারণ নির্বাচন যতদিন না হয়েছে ততদিন এই রায় জনগণের রায় বলে মেনে নিতে পারা যাবে না। জনগণের নাম করে যা খুশি করলেই যে জনগণ সায় দেবে এটা একটা বিভ্রম। একদিন না একদিন ধরা পড়ে যাবেই যে এটা জনগণের স্বার্থেও নয়, সম্মতিতেও নয়।

জনগণের স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন বিচারকমণ্ডলী। জনগণের স্বার্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ স্বাধীন সংবাদপত্রসমূহ। জনগণের স্বার্থ নিরপেক্ষ স্বাধীন বুদ্ধিজীবীমহল। জনগণের স্বার্থ এমন একজন রাষ্ট্রপতি যিনি কোনো দলবিশেষের ইচ্ছায় পরিচালিত ফিগারহেড নন, যিনি ইংলণ্ডের রাজার মতো সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন নিরপেক্ষ স্বাধীন সজ্জন। তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু দ্বিমত হতে দ্বিধাবোধ করবেন না। জাতীয় স্বার্থ যদি তাঁকে পদত্যাগ করতে বলে তবে তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবেন।

আমরা সাহিত্যিক হই না হই আমরা এদেশের নাগরিক। সুতরাং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদেরও ভাবনা চিন্তা স্বাভাবিক ও ভাবনা চিন্তার প্রকাশ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যেটা স্বাভাবিক সেইটেই এখন অস্বাভাবিক ও যেটা ন্যায়সঙ্গত সেটারই প্রকাশ এখন অন্যায়। আমরা যারা স্বাভাবিকতায় ও ন্যায়সঙ্গততায় অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এই আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস গ্রহণ কষ্টকর। যেটা বুক ফুলিয়ে করতে পারতুম সেটা চোরের মতো চুপি চুপি করতে হচ্ছে। হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট এঁরাও তটস্থ। খেলার নিয়ম যেভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে তা দেখে একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আশঙ্কা করছেন যে এদেশে প্রচলিত রোমান জুরিস্‌প্রুডেন্সটাই

পরিত্যক্ত হবে। তার জায়গায় কোন্‌টা প্রবর্তিত হবে, কে জানে! মোগল জুরিসপ্রুডেন্স না সোভিয়েট জুরিসপ্রুডেন্স?

এঁদের কাউকেই আমি কোনো আশার বাণী শোনাতে পারিনি, কারণ আমি নিজেই অন্ধকারে পথ খুঁজে চলেছি। নাগরিক হিসাবে আমিও এঁদেরই মতো সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত। তবে আমার আরও একটা সত্তা আছে। সেটা সাহিত্যিক সত্তা। বিশুদ্ধ সাহিত্যের কাজ নিয়ে থাকলে আমিও বিনোবাজীর মতো রাজনীতি বা আইন কানুন সম্বন্ধে মৌন থাকতে পারি। এখনপর্যন্ত আমার বিশুদ্ধ সাহিত্যকর্মে তেমন কোনো বাধা আসেনি। প্রাক্‌সেনসরশিপের কল্যাণে একটি গল্পের আসল মর্মটাই বাদ পড়েছিল। যখন বই হয়ে বেরোবে তখন সেটা জুড়ে দিতে পারা যাবে। এখনো পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাক্‌সেনসরশিপ জারী হয়নি। কিন্তু পরে সেন্সর করা অসম্ভব নয়। বই বাজেয়াপ্ত হতেও পারে। ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়াও সম্ভব। সেই যে একটা কথা আছে Damocles-এর খড়্‌গ। এটাও সেইপ্রকার একটা প্রহরণ। প্রহরীর তত্ত্বাবধানে প্রহারের ভয়ে লেখা কি স্বাধীনভাবে লেখা? স্বাধীনতাই হচ্ছে সেই লবণ যার অভাবে সব ব্যঞ্জনই বিস্বাদ।

স্বাধীনতা ফিরে না পেলে আমি নির্ভয়ে লিখতে পারব না। যাই লিখি না কেন। সংবিধান সংশোধন যাঁরা করেছেন তাঁরাও কি নির্ভীক থাকতে পারবেন, যদি শাসনযন্ত্র একদিন এমন একটি দলের হাতে পড়ে যে দল তাঁদেরই অস্ত্র তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করবে? গণতন্ত্র ডিক্‌টেটরশিপে পরিণত হলে শিকার হবে গণতন্ত্রীরাই। তাঁদের প্রাণে ভয়ডর না থাকতে পারে, আমাদের প্রাণে আছে। আজকের এই অবস্থা যদি চিরস্থায়ী হয় তবে আমরা বামন বা মেষ বনে যাব। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এ সঙ্কট ছিল না। আমাদের জীবনেও ছিল না। এখন দেখা দিয়েছে। আমরা কি তবে তলিয়ে যাব?

আমরা তাহলে কী করব

বিশ বছর বয়সে পৃথিবীতে আমার একটিমাত্র শত্রু ছিল। নাম তার মুসোলিনি। ত্রিশ বছর বয়সে আরো একটি বাড়ল। নাম তার হিটলার। ব্যক্তিগতভাবে এঁদের কারো সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। দেশগত-ভাবেও আমার স্বদেশের সঙ্গে নয়। কিন্তু যে মতবাদের এঁরা প্রবক্তা সে মতবাদ ছিল আমার নিজের মতবাদের বিপরীত মেরু। আর আমার নিজের মতবাদ ছিল ইংলণ্ডের লোকের জীবনবেদ, পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী। যার জন্যে তারা প্রাণ দিতে পারে। দিয়েছেও বিগত মহাযুদ্ধে। সেই মহাযুদ্ধে আমিও ছিলুম কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিপক্ষে। একজন রাজভক্ত ভারতীয় বলে নয়, একজন গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নাগরিক বলে। তখনকার দিনের যাঁরা কংগ্রেসনায়ক তাঁরাও ছিলেন তাই। আমাদের বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নেওয়া হতো। দশ বছর বয়স থেকেই আমি তার নিয়মিত পাঠক। ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী বা ব্যুরোক্রাট, অতএব তাদের সঙ্গে আমাদের শত্রু সম্পর্ক, কখনো একথা আমাকে কেউ বলেননি। বরঞ্চ এই কথাই বলতেন যে কংগ্রেস যেটা চাইছে সেটাই ভালো আর সেটার অঙ্গীকার তো ইংরেজরাই দিচ্ছে।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মসের চেহারা দেখে অনেকেরই মোহভঙ্গ হয়। তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু যে স্বরাজের দাবীতে অসহযোগ আন্দোলন সেটাও ইংরেজদের দেশের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর ভারতীয় সংস্করণ ভিন্ন আর কিছু নয়। নেতারা স্বরাজ পেলে মোগল বা মারাঠা রাজ ফিরিয়ে আনতেন না। দেশীয় রাজ্যের শাসন পদ্ধতিও ছিল না তাঁদের লক্ষ্য। গান্ধীজী অবশ্য রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন, কিন্তু তাঁর রামরাজ্য ছিল টলস্টয়ের

কিংডম অভ গডের ভাবানুবাদ। যেমন স্বরাজ ছিল ইংরেজদের সেলফ-গভর্নমেন্টের ভাবানুবাদ। তবে তাঁর একটা নিজস্ব মতবাদ ছিল। সেটা কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মতবাদ নয়। সেটা হলো পঞ্চায়তী গণতন্ত্র। গ্রামগুলো হবে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংশাসিত। সেই ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে এক বিশাল পিরামিড। যার চূড়া হবে ক্ষুদ্রায়তন কেন্দ্রীয় সরকার। তার পেছনে সামরিক শক্তি থাকবে না। থাকবে নৈতিক শক্তি। এটা ভারতের অভিনব এক আদর্শ। সম্রাট অশোকের পেছনেও ছিল মহাপরাক্রান্ত মৌর্য সেনা। রামায়ণকে যদি ইতিহাস বলে গণ্য করি তবে রামের পেছনেও কি সামরিক শক্তি ছিল না? কংগ্রেস নেতারা সামরিক শক্তিও চেয়েছিলেন, শুধু রাজনৈতিক শক্তি নয়। সিভিল ও মিলিটারি উভয়বিধ পাওয়ার না পেলে স্বরাজ কখনো পূর্ণাঙ্গ হতো না। তেমন একটি সংবিধানের খসড়া মোতিলাল নেহরু কমিটি প্রণয়ন করেন।

এখন মুসোলিনি ও হিটলার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সে বয়সে আমার ধারণা ছিল যত নষ্টের গোড়া ওই দুই ব্যক্তিবিশেষ। যেন ওদের জন্যেই ইটালীর ও জার্মানীর গণতন্ত্র নষ্ট হলো। হাঁ, কাইজারের পলায়নের পরে জার্মানীতেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিশ্লেষণ করে দেখলুম যে ইটালীর মতো পশ্চাৎপদ দেশ যদি ত্বরিতপদে শিল্পবিপ্লব চায় তো ছায়ার মতো অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রবাদ। ইংলণ্ডে যেটা বিলম্বিত ইটালীতে সেটা দ্রুত। তখন ধনিকে শ্রমিকে বিরোধ বেধে যায়। সে বিরোধ মেটানো যদি গণতন্ত্রের অসাধ্য হয়, মেটাতে গিয়ে দেশ যদি দেউলে হয়, মুদ্রাস্ফীতি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, বেকারসংখ্যা যদি লাফ দিয়ে বাড়ে তাহলে হঠাৎ একজন বা একদল লোক এসে ক্ষমতা আত্মসাৎ করে ও এমন এক সরকার গঠন করে যে সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়ী নয়, সে সরকারের যাঁরা সভাসদ্ তাঁরাও জনসাধারণের কাছে দায়ী নন। নিজের দলটি ছাড়া আর কোনো দলকে এরা টিকতে দেয় না। মুসোলিনির দলের নাম ফাসিস্ট দল। মুসোলিনি নিজে ছিলেন সোশিয়ালিস্ট। পরে হন ফাসিস্ট। সমাজতন্ত্রকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। জোরটা তিনি দেন ইটালীয় জাতীয়তার উপরে। তেমনি হিটলারও দেন জার্মান জাতীয়তার উপরে। তিনিও ছিলেন সোশিয়ালিস্ট। পরে হন ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট। সংক্ষেপে

নাৎসী। সমাজতন্ত্রকে তিনিও পুরোপুরি বিসর্জন দেননি, ধনতন্ত্রকেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি।

ফলশ্রুতি হলো এই যে ধনতন্ত্রেরও আধখানা রইল, সমাজতন্ত্রেরও আধখানা এল, বিনষ্ট হলো শুধু গণতন্ত্র। বড়লোকদের দুর্ভাবনা গেল, আর ধর্মঘট ইত্যাদি ঘটছে না। গরিবদের দুর্ভাবনা গেল একেবারে নিষ্কর্মা ও নিরন্ন থাকতে হচ্ছে না। মধ্যবিত্তদের দুর্ভাবনা গেল, মুদ্রাস্ফীতির দরুন তাদের জীবনযাত্রা দুর্বহ হচ্ছে না। তা হলে কেন কেউ গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ দেবে? যেমন দিয়েছিল ইংরেজরা যুদ্ধকালে। পরেও দিত, যদি তাদের দেশে গণতন্ত্র খতম হতো। সঙ্কটকালে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে ইটালীর গণতন্ত্র ত্বরান্বিত শিল্পবিপ্লবের টাল সামলাতে পারল না, নইলে ইটালীর জনসাধারণ যে গণতন্ত্রবিরোধী বা নাগরিক অধিকারে উদাসীন তা নয়। জার্মানীর জনসাধারণও নয়। শিল্পবিপ্লব কাইজারের আমলেই ত্বরান্বিত হয়েছিল, সমাজতন্ত্রও এগিয়ে রয়েছিল। যুদ্ধোত্তরকালে ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে নিদারুণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বেকারসংখ্যা অতিস্ফীত হয়, তাই জার্মানীর গণতন্ত্র টলমল করতে থাকে। নইলে জার্মানী যে গণতন্ত্রবিরোধী বা নাগরিক অধিকারে উদাসীন তাও নয়। উভয় ক্ষেত্রেই স্ট্যাবিলিটির প্রয়োজন মেটায় ডিকটেটরশিপ। অধিকাংশ লোক কী চায়? স্ট্যাবিলিটি। যে যা চায় সে তা পায়।

ইংরেজ রাজত্ব যে এতকাল স্থায়ী হলো তার মূলেও সেই স্ট্যাবিলিটির প্রয়োজন। সেটা মেটাতে পারত সাম্রাজ্যবাদী ব্যুরোক্রাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধাক্কা সইতে না পেরে তাকেও বিদায় নিতে হলো। দেশ হলো জ্ঞাতিবিবাদে দু'ভাগ। এখন যে অংশের নাম ভারত সেখানেই স্ট্যাবিলিটি বেশী, পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে কম। এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। গণতান্ত্রিক শাসনেও যে স্ট্যাবিলিটি রক্ষিত হতে পারে সেটা সম্ভব হয়েছে সুদীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যাঁরা এক শিবিরে থেকে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে শিখেছিলেন তাঁদের সেই শিক্ষানবিশীর জন্যেই। এঁরা সবাই সবাইকে চেনেন। সকলেই সকলের সহকর্মী। হাইকমাণ্ডকে মেনে চলাও এঁদের অভ্যাস। কিন্তু ত্বরান্বিত শিল্পবিপ্লব, ধনিকদের পৌষমাস, শ্রমিকদেরও পিঠে পার্বণ, সৈনিকদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি, দেশকে এই ত্রিশ বছরে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে শ্রেণীবিরোধের অভিমুখে। কংগ্রেসকেও জার্মানীর সোশিয়াল

ডেমোক্রাটদের অনুবর্তন করতে হচ্ছে। সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা একদিকে ছিলেন ডেমোক্রাট, আরেকদিকে সোশিয়ালিস্ট। দুই দিক সামাল দেওয়া যে কী কঠিন তা জার্মানদের দেশে গিয়ে আমি বুঝতে পারি বলেই পরবর্তী-কালে কংগ্রেসের একজন উদীয়মান নেতাকে লিখি, দেশ একদিন স্বাধীন হবে, তখন কংগ্রেসই হবে এ দেশের সোশিয়াল ডেমোক্রাট পার্টি। হয়তো তারই মতো একদিন ব্যর্থ হবে, যদি আগে থেকে সাবধান না হয়।

সোশিয়ালিজম নামক তত্ত্বটির মধ্যে এমন কোনো কথা নেই যে এটি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ব্যর্থতার উপরেই নির্ভর। ইংলণ্ডের লেবার পার্টিও একটি সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক পার্টি। একাধারে সোশিয়ালিস্ট তথা ডেমো-ক্রাটিক। লেবার পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বার বার সে দেশ শাসন করেছে ও এখন করছে। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তা হলে অপোজিশনে বসবে। ছায়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করবে। পরে আবার কায়া ধারণ করবে। তবে ইংলণ্ডের সুবিধা হলো সে দুই শতাব্দী ধরে শিল্পবিপ্লব চালিয়ে এসেছে। তাই সে বিপ্লবের লয়টা বিলম্বিত লয়। তেমন বিপ্লবকে বিবর্তন বলাই সঙ্গত। ইংলণ্ডের জনগণ বিবর্তনধর্মী। রেভোলিউশন নয়, এভোলিউশন ওদের রক্তে। সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীতেও। সেখানকার কনসারভেটিভরাও বিবর্তনশীল। লিবারলরাও তাই। লেবার পার্টির সদস্যরাও তাই। মুষ্টিমেয় একদল কমিউনিস্ট এখনো দিন গুণছে সমাজবিপ্লবের। তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা সেই পরিমাণে আছে যে-পরিমাণে তারা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভের যোগ্য। পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকাংশ যেদিন কমিউনিস্ট হবে ইংলণ্ডও সেদিন কমিউনিস্ট শাসন মেনে নেবে। সংবিধানে কোনো বাধা নেই। সমাজতন্ত্রবাদ নামক তত্ত্বটিতেও কোনো বাধা নেই। বাধা যদি থাকে সেটা আছে কমিউনিস্টদের নিজেদের ডগমায়। তাদের ডগমা অনুসারে বিবর্তন নয়, বিপ্লবই অবশ্যম্ভাবী। পার্লামেণ্টারি প্রোসেসের ভিতর দিয়ে নয়, বিপ্লবের প্রসবযন্ত্রণার ভিতর দিয়েই পৃথিবীর প্রথম শ্রমিকরাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সুতরাং একে একে প্রত্যেকটি শ্রমিকরাষ্ট্রই অমনি করে ভূমিষ্ঠ হবে। বিধাতার লিখনের মতো ইতিহাসের লিখন।

রুশদেশে ইংলণ্ডের মতো দূরের কথা ইটালীর মতো পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও ছিল না। যা ছিল না তার ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠতে পারে না।

একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে রুশদেশে পরীক্ষা করে দেখা গেল পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী ব্যর্থ হয়েছে। যেটা সে দেশে ব্যর্থ হলো সেটা গণতন্ত্র নয়, জারতন্ত্র। সে জিনিস কি ইংলণ্ডে আছে, না ফ্রান্সে আছে, না আমেরিকায় আছে, না ভারতে আছে যে তার ব্যর্থতার প্রশ্ন উঠবে? এসব দেশের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী যদি ব্যর্থ হয় তবে যেটা ছোঁ মেরে ক্ষমতা কেড়ে নেবে সেটা মুসোলিনিমার্কা ফাসিজম বা হিটলারমার্কা ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম বা ফ্রাঙ্কোমার্কা মিলিটারি ডিকটেটরশিপ। তার সঙ্গে মোকাবিলায় জিততে হবে কমিউনিস্টদের, যদি জনগণের সশস্ত্র শক্তি পেছনে থাকে। সে পরিস্থিতিতে সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা তুলবেই বা কে? তুললে শুনবেই বা কে?

এখনপর্যন্ত যে সব দেশে গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় নি সে সব দেশে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির মতো গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই সরকার গঠন করেছে। তবে লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে ইটালীতে অচিরেই কমিউনিস্ট পার্টিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবে। কিন্তু এই শর্তে যে, পরে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তা হলে সরকার পক্ষের আসন থেকে সরে বিরোধীপক্ষের আসনে বসবে। অর্থাৎ তাকে ইংলণ্ডের লেবার পার্টির পন্থা অনুসরণ করতে হবে। ওরা বিবর্তনধর্মী, বিপ্লবধর্মী নয়। বিপ্লব যাদের ধর্ম তাদের হটাবার জন্যে অপেক্ষা করে প্রতিবিপ্লব। বিবর্তন যাদের ধর্ম তাদের হটাবার জন্যে অপেক্ষা করে কনসারভেটিভ বা লিবারল দল। ইটালীর কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই এটা বোঝেন যে একবার পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতা-সীন হয়ে তারপর সেটাকে ভূমধ্যসাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যাবে না।

এটাও মনে রাখতে হবে যে রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত হলেও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণী তার বিভিন্ন ঘাঁটির উপর দখল কায়েম রাখে। সে-সব ঘাঁটি থেকে তাকে হটানো কেবলমাত্র আইন পাশ করলেই হয় না। হুকুমনামা জারী করলেও হয় না। সে আদালতে যায়, সেখানে তার পক্ষে লড়ে উকীল ব্যারিস্টার। সেখানকার প্রোসিডিওর দীর্ঘসূত্রী। তাকে সংক্ষেপ করাও সহজ নয়। সর্বত্রই দেখা যায় আদালত সম্পত্তির প্রতি সদয়। নয় কেবল কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতেই। সেসব রাষ্ট্র রক্তপাতের ভিতর দিয়ে না গেলে আদালতের প্রাচীর অতিক্রম করা তাদেরও দুঃসাধ্য হতো। কমিউনিস্ট নয়, অথচ সোশিয়ালিস্ট এমন রাষ্ট্র যদি কোথাও থাকে তবে সে দেশ বড়ো-

জোর কয়েকটা কলকারখানা বা কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। রায়তের জমি, মুদীর দোকান, তেজারতীর ব্যবসা যেমনকে তেমন রয়েছে। বাড়ীওয়ালারা বাড়ীভাড়াও আদায় করছে। এদের গায়ে হাত পড়লে এরাই হবে ফাসিস্ট বা নাৎসী। কিন্তু ভেক ধারণ করবে সোশিয়াজিমের। পার্টির নামকরণ দেখে বেআইনী বলতে পারা যাবে না। তথাকথিত সোশিয়ালিস্ট নামাবলীর আড়ালে থাকবে সুদখোর, মুনাফাখোর, ভাড়াজীবী।

ত্রিশ বছর আগে আমি উপলব্ধি করি যে কাইজারের বিদায়ের পর জার্মানীর যে অবস্থা হয় কাইজার-ই-হিন্দের অর্থাৎ ভারতসম্রাটের বিদায়ের পর ভারতেরও সেই অবস্থা হবে। এর পরের অধ্যায়টা হবে ভাইমার রেপাবলিকের ও ভাইমার কনস্টিটিউশনের অনুরূপ। তবে দেশভাগের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না, সেটা তখন জার্মানীতে ঘটেনি, তার কারণ সেটা আরো আগে ঘটে রয়েছিল, যখন ক্যাথলিকদের ভাগে পড়ে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ও প্রটেস্টাণ্টদের ভাগে পড়ে জার্মান সাম্রাজ্য বা সংক্ষেপে জার্মানী। এই পর্বটা তখন মনে হয়েছিল অর্থহীন, এখন বুঝতে পারছি অপ্রতিরোধ্য। এটা যখন সারা হয়ে গেল তখন সংবিধান রচনাও অপেক্ষাকৃত সুগম হলো, নইলে তিন বছর কেন তেইশ বছরেও হতো না। কতকাল লাগল পাকিস্তানে? তাও বাংলাদেশ বেরিয়ে যাওয়ার পর। ইসরায়েল এখনো তার সংবিধান রচনা করতে পারে নি। লেবানন যেটা করেছিল সেটা একটা কাঁচা রকম আপস, তাই এখন গৃহযুদ্ধে জর্জর। সর্বস্বীকৃত সংবিধান এখনো বহুদূরে। তার অভাবে লেবানন দু'ভাগ হয়ে যেতে পারে।

সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংরচিত হলো। স্থাপিত হলো ভাইমার রেপাবলিকের অনুরূপ একটি সেকুলার ডেমোক্রাটিক রাষ্ট্র। যে দলটির উপর শাসনভার ন্যস্ত হলো সেটিও একটি সোশিয়াল ডেমোক্রাটিক পার্টি। যদিও সোশিয়ালিস্ট শব্দটি সে সময় ব্যবহার করতে বাধা ছিল। কারণ জওহরলাল ও আজাদ সোশিয়ালিস্ট হলেও বল্লভভাই ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ তা ছিলেন না। আপস হিসাবে সংবিধানে সোশিয়াল জাসটিস কথাটি ব্যবহার করা হয়। পরে কংগ্রেসের অধিবেশনে ব্যবহার করা হয় সোশিয়ালিস্ট প্যাটার্ন পদটি। কংগ্রেস দু'ভাগ হয়ে যাবার পর সোজাসুজি সোশিয়ালিস্ট শব্দটি ব্যবহার করতে আর বাধা রইল না। কংগ্রেসের বৃহত্তর ভাগটি এখন অবাধে সোশিয়ালিস্ট ডেমোক্রাট বা সোশিয়াল ডেমোক্রাট হয়েছে। এমন যে হবে

এটা আমি অনুমান করেছিলুম। এতে আমি বিস্মিত হইনি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়েছে সংশোধিত সংবিধানে ভারতরাষ্ট্রের নামকরণে 'সোশিয়ালিস্ট' বিশেষণটির ব্যবহার। একটি পার্টি নিজেকে সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট, ফাসিস্ট, কনসারভেটিভ, লিবারল, র‍্যাডিকাল ইত্যাদি যে কোনো মতবাদের দ্বারা বিশেষিত করতে পারে। সে অধিকার তার আছে। কিন্তু রাষ্ট্রকে সোশিয়ালিস্ট বলে বিশেষিত করা কি তার অধিকার অন্তর্ভূর্ত না অধিকার বহির্ভূত? পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেলেই কি রাষ্ট্রের চরিত্র বরাবরের জন্যে নির্দিষ্ট করবার অধিকার বর্তায়? তা হলে পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট বলে বিশেষিত করে মুসলিম লীগ কী অপরাধ করল? কে জানে জনসঙ্ঘও তো একদিন পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। তখন সে যদি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে অভিহিত করে সংবিধান শোধরায় তখন সেটা কি তার অধিকার বহির্ভূত হবে না অধিকার অন্তর্ভূত হবে?

এতে শুধু ক্যাপিটালিস্ট বা দক্ষিণপন্থীদের আঘাত করা হলো না। হলো গান্ধীপন্থী কর্মীদেরও। তাঁরাও এক জাতের সোশিয়ালিস্ট। কিন্তু তাঁদের ওটা ইউটোপিয়ান সোশিয়ালিজম গোত্রের। তাঁরা চান রাজনৈতিক তথা অর্থ নৈতিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে। তাঁরাও চান সামাজিক ন্যায়। কিন্তু রাষ্ট্রকে তাঁরা সর্বশক্তিমান করতে নারাজ। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যদি থাকে তবে সে দেশরক্ষা প্রভৃতি কয়েকটা কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ন্যূনতম ক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। জমির মালিকানা সম্পত্তির মালিকানা প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয় রাষ্ট্রের মনোপলি অহিংসভাবে হতে পারে না। আর হিংসার প্রয়োগ অধিকাংশের ভোটে হলেও সেটা গান্ধীপন্থীদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। প্রতিরোধ করা না করা আপাতত জরুরি হয়ে ওঠে নি। শুধু জানিয়ে রাখলেই চলবে যে রাজকীয় হিংসার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য যাঁদের কাছে আপত্তিকর ছিল রাষ্ট্রীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রও তাঁদের কাছে আপত্তিকর। আর এ তো জানা কথা যে সোশিয়ালিস্ট স্টেট বলে যেসব রাষ্ট্র আত্মপরিচয় দেয় সেসব রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তরে বিশ্বাস করে না। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর বৈশিষ্ট্য এইখানে যে ক্ষমতাসীন নির্বাচিত পার্টিকে সে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার পর ক্ষমতা

আঁকড়ে ধরে থাকতে দেয় না। নতুন করে নির্বাচনে নামতে ও অধিকাংশের আস্থা অর্জন করতে বাধ্য করে। সে বার বার নির্বাচিত হয়ে সুইডেনের সোশিয়ালিস্টদের মতো একটানা চুয়াল্লিশ বছর ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতার হস্তান্তরের জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকে। ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে তখনি, যখন নির্বাচকদের রায় তার বিরুদ্ধে যায়। সুইডেনের সোশিয়ালিস্টরা চুয়াল্লিশ বছর ধরে আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রকে সোশিয়ালিস্ট স্টেট বলে বিশেষিত করে নি। তুমি নিজে সোশিয়ালিস্ট হতে পারো, কিন্তু রাষ্ট্রকেও যদি সোশিয়ালিস্ট বলে ঘোষণা কর তা হলে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে কেমন করে? তা হলে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর বৈশিষ্ট্য রইল কোথায়? এটাই হল আজকের দিনের প্রশ্ন।

গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে আমার মিল যেমন আছে, অমিলও তেমনি আছে। এখন আমি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি সে ভূমিকা একজন গান্ধীপন্থীর নয়। সে ভূমিকা একজন লেখকের, শিল্পীর, বুদ্ধিজীবীর। আমার কাজ হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়কে জলের মতো পরিষ্কার করা, যাতে পাঠকরা বা শ্রোতারা নিজেরাই চিন্তা করে বুঝতে পারেন কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ। এখনো নির্বাচন প্রথা রদ হয় নি, বদল হয় নি। এখনো আমরা সবাই নাগরিক, সবাই নির্বাচক। আমাদের মতামতের দাম এখনো কিছু আছে। যদিও সংবিধান সংশোধনের আগে আমাদের মতামত কেউ জানতে চাননি। নানান কারণে আমি সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের পছন্দ করি। কিন্তু পক্ষভুক্ত নই। চিরকাল আমি অপক্ষপাত, সরকারের সামিল থেকেও স্বকীয়তা রক্ষা করেছি। পক্ষভুক্ত নই বলেই আমি স্বাধীনভাবে আমার বক্তব্য দেশবাসীকে শোনাতে বা জানাতে ইচ্ছা করি। এটা একজন ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে আমার কর্তব্য।

পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী যদি ভারতের অনুপযুক্ত হয়ে থাকে তবে তার সংশোধনের কী প্রয়োজন? তাকে শেষ করে দাও। কী দরকার ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মতো সোভরেন হওয়ার, যদি তার স্পিরিট না হয় ইংরেজের মতো বা পার্লামেণ্টের মতো? এই সংশোধনের পাঠ পড়ে ইংলণ্ডে এমন কোনো ইংরেজ নেই বা সেখানকার পার্লামেণ্টে এমন কোনো মেম্বার নেই যিনি চিনতে পারবেন যে এটা তাঁদের ঐতিহ্যের অনুসরণ। সোশিয়ালিজম প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কংগ্রেসকে সোশিয়ালিস্ট বিশেষণে

বিশেষিত করাই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে বলতে হয় কংগ্রেস প্রাইভেট প্রপার্টি রাখতে দেবে কি দেবে না, রাখতে না দিলে ক্ষতিপূরণ দেবে কি দেবে না, রাখতে দিলে কী কী শর্ত আরোপ করবে। সোশিয়ালিজমের আদত কথাটাই তো সম্পত্তির মালিকানা ঘটিত। সেটাকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যে ছবিটা ফুটে বেরোচ্ছে সেটা সোশিয়ালিজমের অভিমুখে পদক্ষেপ না ডেমোক্রাসীর উল্টোদিকে পদক্ষেপ, আমিই তো ঠাহর করতে পারছিনে। ইংরেজদের কেমন করে বোঝাব?

তবে এর দ্বারা একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, যদি সেটাই হয়ে থাকে উদ্দেশ্য। জার্মানীর মতো কমিউনিস্টরা বলতে পারবে না যে, "সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা হচ্ছে আসলে সোশিয়াল ফাসিস্ট। তাদের চেয়ে নাৎসীরা কম খারাপ। অতএব নাৎসীদের সঙ্গে হাত মেলাও, কমরেড। সোশিয়াল ফাসিস্টদের বিদায় করো।" জার্মানীর মতো নাৎসীরাও বলতে পারবে না যে, "সোশিয়াল ডেমোক্রাটরা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। তাদের চেয়ে কমিউনিস্টরা কম খারাপ। অতএব কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাও, স্যাঙাত। সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের বিদায় করো।" বলা বাহুল্য সোশিয়াল ডেমোক্রাটদের পরাজয়ের পর নাৎসীরাই প্রবল হয়ে কমিউনিস্টদেরও বিদায় করত।

আমরা তা হলে কী করব? আমরা যারা সোশিয়াল ডেমোক্রাটও নই, ফাসিস্টও নই, কমিউনিস্টও নই। আমরা যারা লিবারল বা র‍্যাডিকাল, গান্ধীপন্থী বা ফেবিয়ান। কিংবা আমার মতো স্বভাবে নন্-কন্ফর্মিস্ট তথা চরিত্রে ডেমোক্রাট।

যে খেলার যা নিয়ম

কংগ্রেস তার জন্মকাল থেকেই বলে এসেছিল যে ইংরেজদের পার্লামেণ্টের মতো একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি সভাই ভারতের পক্ষে কাম্য। ইংরেজ মহলে কিন্তু এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল। যেমন ছিল ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের বেলা। দেশটা যখন প্রাচ্য তখন সেখানে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন না করে প্রাচ্যবিদ্যা সংরক্ষণ করাই শ্রেয়, এ যেমন ছিল একশ্রেণীর ইংরেজের মত তেমনি অপর একশ্রেণীর মত ছিল দেশটাকে আধুনিক করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করাই ভালো। কিন্তু লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। তেমনি একশ্রেণীর ইংরেজের মত ছিল প্রাচ্যদেশে কখনো পাশ্চাত্য গণতন্ত্র শিকড় পাবে না। বৃথা তার বীজ বোনা। তাই যদি হয় তবে তার বিকল্পটা কী? রাজা মহারাজাদের হাতে দেশটাকে তুলে দেওয়া? স্বৈরতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা? না ব্যুরোক্রাসীকে চিরটাকাল বহাল রাখা? ভারতপ্রবাসী ইংরেজ রাজকর্মচারী ও বণিকদের সুপারিশ যাই হোক না কেন এক শ্রেণীর ইংরেজ সরাসরি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রবর্তনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেই কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকা ব্যুরোক্রাসীর কঠোর সমালোচনা ও পাশ্চাত্য পদ্ধতির স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রস্তাব করত। লর্ড রিপনেরও মত ছিল তার অনুরূপ। এঁদের মতো ইংরেজরাই কংগ্রেসকে আসরে নামান ও তাকে উৎসাহ দেন। বলা বাহুল্য কংগ্রেসের নায়করাও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাঙালী বুর্জোয়া।

পরবর্তীকালে এ বেচারাদের টিটকারী দিয়ে বলা হলো যে এরা মডারেট। দেশের জনমত গেল যাঁদের দিকে তাঁরা চরমপন্থী বা একস্ট্রীমিস্ট বলে প্রখ্যাত। তাঁদের মতে ইংরেজদের কোনো জিনিসই গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশীমাত্রেই

মন্দ। সুতরাং পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও হেয়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'স্বদেশী সমাজ'। তাতে আত্মনির্ভর সমাজব্যবস্থার গুণগান আছে। কিন্তু সেটা পার্লামেণ্টারি রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। মহাত্মা গান্ধী লেখেন 'হিন্দ্ স্বরাজ'। তাতে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে বলা হয় আজ এ দলের রক্ষিতা, কাল ও দলের রক্ষিতা। ভারতের জন্যে চাই চিরাচরিত গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ। পাকা স্বদেশী। ইংরেজবিদ্বেষ দিনকের দিন বাড়তে থাকে। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপর যেমন একশ্রেণীর ইংরেজ তেমনি একশ্রেণীর ভারতীয়ও বিরূপ। উৎকট সাম্রাজ্যবাদী তথা উগ্র জাতীয়তাবাদী দুই শিবিরই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীকে ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে অপাঙক্তেয় করেন। কিন্তু অপর শ্রেণীর ইংরেজরা বুঝতে পারে যে একস্ট্রীমিস্টদের থেকে মডারেটদের আলাদা করাই রাজনৈতিক সুবুদ্ধি। তাই ইংলণ্ডের লিবারল পার্টি মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তন করেন। মর্লে ছিলেন সত্যিকার লিবারল। তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর বিপক্ষে। আর মিন্টো ছিলেন ব্যুরোক্রাসীর মুখপাত্র। মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে আলাদা করতে হবে এই পলিসির স্বপক্ষে। একটার সঙ্গে আরেকটার সমাস ঘটিয়ে যেটা হলো সেটা তখন তো মনে হয়েছিল গণতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। বিনা শর্তে ইংরেজরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করত না। শর্তটা হলো এক এক সম্প্রদায়ের এক এক পঙ্‌ক্তি। প্রাচ্যদেশের যেমন সমাজ-ব্যবস্থা তেমনি তো রাষ্ট্রব্যবস্থা।

দেশের লোক যখন স্বরাজের জন্যে সত্যাগ্রহ করতে সংকল্প নেয় তখন পার্লামেণ্টারি পদ্ধতি স্বভাবতই পরিত্যক্ত হয়। গান্ধীজী তাঁর সেই 'হিন্দ্ স্বরাজে'র থীসিস মেনে চলেন। তাঁর শিষ্যরা তাঁর থীসিস না মানলেও তাঁর নির্দেশ মান্য করেন। পরে কিন্তু তাঁর কারাবাসকালে কংগ্রেস নেতারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একভাগ বলেন, মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। অপরভাগ বলেন, না, একেবারে পরিত্যাজ্য নয়। আমরা যদি কাউন্সিলে না যাই অন্যেরা যাবে ও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। তাদের আমরা ঢুকতেই দেব না। আমরাই ক্যাপচার করব ও তারপরে অসহযোগ করব। গেলেন তাঁরা কাউন্সিলে। মহাত্মাকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন। ফল কিছুই হলো না। তবে, হাঁ, মডারেটদেরকে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে বিদায় করলেন। এর পরে লবণ সত্যাগ্রহ ও গণসত্যাগ্রহ। আরো একদফা শাসন সংস্কার। আবার সেই একই যুক্তি। আমরা যদি ক্যাপচার না করি অন্যেরা

ক্যাপচার করবে ও মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে। সেটা জাতীয় স্বার্থবিরোধী। অতএব এই বিজাতীয় পার্লামেণ্টারি প্রথা আমাদের বরণীয়। মহাত্মা এবার বাধা দিলেন না, তিনি নিজেই কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

যাঁরা ১৯৩৬ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হলেন ও যাঁরা ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভায় নির্বাচিত হলেন তাঁদের কতক মন্ত্রী হলেন, পরে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে জেলে গেলেন, অন্যেরাও জেলে গেলেন, কিন্তু তাঁরা বা তাঁদের দলের পার্লামেণ্টারিয়ানরা কেউ আইনসভার সভ্য পদে ইস্তাফা দিলেন না। স্বাধীনতার পর সংবিধান রচনাকালে কোথায় রইল পঞ্চায়তী গণতন্ত্রের স্বদেশী আদর্শ! সেণ্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর নাম পালটিয়ে রাখা হলো লোকসভা, কাউন্সিল অফ স্টেটের রাজ্যসভা, উভয়ের যৌথ নাম পার্লামেণ্ট। পরিষ্কার ইংলণ্ডের অনুকরণ।

ফুটবল ক্রিকেট যেমন বিলেত থেকে নেওয়া পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও তেমনি। ফুটবল ক্রিকেটের মতো এরও দুই পক্ষ। সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ। বিরোধী পক্ষের নেতাকে বিলেতে প্রধানমন্ত্রীর মতো মাইনে দেওয়া হয়। তাঁরও একটা ছায়া মন্ত্রীসভা থাকে। নির্বাচনে জিতলে তিনি ও তাঁর ছায়া মন্ত্রীসভা শাসনভার পান। বিরোধী পক্ষ জানেন যে একদিন না একদিন তাঁরাই সরকার পক্ষ হবেন, সেইজন্যে দায়িত্বহীনভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না। যে খেলায় যা নিয়ম। খেলাটা যখন পার্লামেণ্টারি তখন দুই পক্ষকেই নিয়ম মান্য করতে হয়। সেই নিয়ম মেনে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিকরাও নির্বাচনে জিতে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেছেন ও তাঁদের হুকুমে সরকারী দফতরগুলো চলছে। সৈনিকরাও তাঁদের হুকুম অমান্য করে না। রাজা বা রাণী তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিটা বুর্জোয়াদের কারসাজি নয়। শ্রমিকরাও সে খেলায় ওস্তাদ। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী একদা অভিজাতদের খেলা ছিল, এখন আর সে কথা বলা চলে না। এখন সেটা সর্বসাধারণের খেলা। অভিজাতরাই লর্ড উপাধি ত্যাগ করে কমনার হচ্ছেন, যাতে কমনার হয়ে হাউস অফ কমনসের সদস্য হতে পারেন। সেটাই এখন ক্ষমতার ঘাঁটি, হাউস অফ লর্ডস নয়।

বিরোধী পক্ষ থাকবে না একথা ইংলণ্ডের লোক ভাবতেই পারে না। বিরোধীপক্ষ না থাকলে মনোনয়নের অবকাশ থাকে না। মনোনয়নের

অবকাশ না থাকলে মনোনয়নের স্বাধীনতাও থাকে না। মনোনয়নের স্বাধীনতা না থাকলে এটাও একপ্রকার ডিক্টেটরশিপ। ইংলণ্ডের লোক কোনো প্রকার ডিক্টেটরশিপ বরদাস্ত করবে না। যিনি হিটলারকে হারিয়ে দিয়ে দেশরক্ষা করলেন সেই চার্চিলকেই তারা পরবর্তী নির্বাচনে হারিয়ে দিল। এই পদ্ধতির এমন কতকগুলো সুবিধা আছে যা আর কোনো পদ্ধতির নেই। সেইজন্যে ইংলণ্ডের দীনহীনরাও আর কোনো পদ্ধতির অনুরাগী নয়। অধৈর্য হয়ে যারা প্রোলিটারিয়ান ডিক্টেটরশিপের স্বপ্ন দেখত তারাও সে স্বপ্ন দেখে না। অল্পসংখ্যক ফাসিস্টও ছিল, এখনো আছে। সাধারণ লোক তাদের পাত্তা দেয় না। খেলাটা পার্লামেন্টারি। সে খেলার নিয়ম যারা মানবে না লোকেও তাদের খেলায় যোগ দেবে না।

ফুটবল খেলায় একজন রেফারি থাকেন, তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। সেইজন্যে উভয়পক্ষের আস্থাভাজন। বিশেষ একজন রেফারি হয়তো পক্ষপাতদুষ্ট ও অনাস্থাভাজন। তাই বলে রেফারিমাত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট ও অনাস্থাভাজন নয়। যেমন করে হোক একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ রেফারিকে খুঁজে বার করতেই হয়, নইলে খেলা জমে না। মারামারির মধ্যে ভেঙে যায়। ফুটবল খেলায় যেমন একজন রেফারি চাই যিনি উভয়পক্ষের কাছে মান্য তেমনি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসীতেও চাই একটি জুডিসিয়ারি বা বিচারকমণ্ডলী। লোকে এঁদের রায়কেই চূড়ান্ত বলে শিরোধার্য করে। সে রায় হয়তো সব সময় অভ্রান্ত হয় না। হবে কী করে? মানুষ তো? মানুষমাত্রেই ভুলচুক করে। সেটা যদি ইচ্ছাকৃত না হয় তবে মার্জনীয়। আর যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তেমন মানুষকে বিচারভার দিয়ো না। এটা হলো ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তির প্রশ্ন। এর জন্যে সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টকে দায়ী করা উচিত নয়। সুপ্রীমকোর্ট যদি সুপ্রীম না হয়, হাইকোর্ট যদি হাই না হয় তা হলে তো একপক্ষ বরাবর ফাউল করে যাবে, আরেকপক্ষ নিষ্ফল আক্রোশে মারামারি বাধিয়ে দেবে। দর্শকরাও জুটে যাবে এপক্ষে ওপক্ষে। দক্ষযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার জন্যেই জুডিসিয়ারি। তাই জুডিসিয়ারিকেও রক্ষা করতে হয়। রক্ষা করতে হলে উপযুক্ত মানমর্যাদা, প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ আস্থা নিবেদন করতে হয়। একটা পঙ্গু, অথর্ব সুপ্রীমকোর্ট বা বিকলাঙ্গ হাইকোর্ট কার কোন্ কাজে লাগবে, যদি পার্লামেন্টের একপক্ষের সঙ্গে আরেকপক্ষের কথা কাটাকাটি থেকে মাথা কাটাকাটি বেধে যায়?

ভাববার সময় এসেছে আমরা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী নামক বিলিতী মালটিকে ভারতমহাসাগরের জলে বিসর্জন দেব কি না। তা যদি করতে চাই সেটা জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে বেখাপ হবে না। কিন্তু তার আগে চিন্তা করতে হবে বিলিতী মালটির স্বদেশী বিকল্প কোথায়? পঞ্চায়তী গণতন্ত্র আমি দেশীয় রাজ্যে দেখিনি, যদিও সেখানে জন্মেছি। ইতিহাসেও তার নজীর দেখিনি, যদিও ইতিহাসের ছাত্র। বিনোবাজী তো পঁচিশ বছর ধরে উপদেশ বর্ষণ করে চলেছেন। একটিও গ্রামসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? জয়প্রকাশজীর আন্দোলনের ফলেও কি কোথাও গড়ে উঠেছে? কোথাও যদি সেরকম কিছু দেখতে পাওয়া যায় তো তার দৌড় ওই গ্রাম অবধি। ওই ধরনের সভা নিম্নতম স্তর থেকে উর্ধ্বতম স্তর পর্যন্ত সংস্থাপন করতে হলেও একটি সংবিধান আবশ্যক হবে। সংবিধান থাকলে আবার তেমনি দুই পক্ষই থাকে। দুই পক্ষের জন্যে খেলার নিয়মও বেঁধে দিতে হয়। খেলাটা ফুটবল না হয়ে কাবাডি হলেও একজন রেফারির দরকার হবে। রেফারি শব্দটা পছন্দ না হলে সালিশ। ধর্মাধিকরণ এদেশে চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে। ক্ষমতা এমন জিনিস যার জন্যে পাণ্ডবে কৌরবে কুরুক্ষেত্র বেধেছিল। যখন সমাজতন্ত্রের যুগ আসবে তখন শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা নয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়বে। অর্থম্ অনর্থম্।

না, একদল সাধুসন্ন্যাসীর হাতে দেশটাকে সঁপে দিয়েও এ সমস্যার সমাধান হবে না। বিকল্প যদি থাকে তো আছে রুশদেশে ও চীনদেশে। তা হলে তো আবার তেমনি বিদেশী মালের আমদানী করতে হলো। সেটা যে পার্লামেণ্টারি নয় তা কে না জানে! সেটাও নাকি একপ্রকার ডেমোক্রাসী। হতেও পারে। কিন্তু এখনো আমরা কেউ সে পুডিং চেখে দেখিনি। পরের মুখেই মিষ্টি খাচ্ছি।

ইংরেজ চলে গেলে ইংরেজদের জাতীয় খেলা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী কি আমাদের জাতীয় খেলা হবে? না আমরা পঞ্চায়তী গণতন্ত্রের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাব? না রুশদেশ থেকে আমদানী করব ওদের জাতীয় খেলা প্রোলিটারিয়ান ডিকটেটরসিপ বা পীপলস ডেমোক্রাসী? ত্রিশ বছর আগে আমরা কেউ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলুম না, দিল্লীর সংবিধান সভা সর্বসম্মতিক্রমে ইংরেজবর্জিত ভারতবর্ষে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী বা পঞ্চায়তী গণতন্ত্র বা সোভিয়েট শাসনপদ্ধতির কোন্‌টা প্রবর্তন করবে। মুসলিম

লীগের অনুমোদন বিনা সংবিধান আদৌ সংরচিত হতো কিনা এটাও ছিল আমাদের অন্যতম জিজ্ঞাসা।

মুসলিম লীগকে আলাদা একটা খণ্ড আপসে ছেড়ে না দিলে অখণ্ড ভারতবর্ষের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে সংরচিত হতো না। পার্লামেণ্টারিও না, পঞ্চায়তীও না, সোভিয়েটমার্কা তো নয়ই। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে তিনি হয়তো বিকেন্দ্রীকরণের উপরে জোর দিতেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই যে তুরুপের তাস এমারজেন্সী ঘোষণা এখানা কি তিনি বিনাবাক্যে তুলে দিতেন? এমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে এই যে সংবিধান সংশোধন, যার ফলে কেন্দ্র হয়েছে সর্বেসর্বা, এটা কি তিনি অনুমোদন করতেন?

খণ্ডিত ভারতের সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে সংরচিত হয়। আপত্তি যাঁদের থাকতে পারত তাঁরা তখন পাকিস্তানে। আর যাঁদের আপত্তি ছিল তাঁরা বারো রাজপুত। কেউ বা সোশিয়ালিস্ট, কেউ বা কমিউনিস্ট, কেউ বা হিন্দুরাষ্ট্রবাদী। কেউ কেউ বা বিশুদ্ধ গান্ধীবাদী। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই। আদর্শের মিল নেই। সংবিধান সভায় গেলে এঁরা যে সবাই মিলে বিকল্প সংবিধান সংরচন করতে পারতেন তাও নয়। পারলেন যাঁরা তাঁদের কেরামতও ইংরেজদের বহু কষ্টে তৈরি ১৯৩৫ সালের গভর্নমেণ্ট অভ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মেরামত। ওটার পেছনে ছিল মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস। সেটার পেছনে ছিল মর্লে-মিন্টো রিফর্মস। তার আগেও ছিল কংগ্রেসের আদিপর্বের নেতাদের আন্দোলনের ফলে সরকারী আইনসভাগুলিতে বেসরকারী প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ব্যবস্থা। রোম নগর একদিনে নির্মিত হয়নি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানও তিন বছরে বিধিবদ্ধ হয়নি।

পার্লামেণ্টারি পদ্ধতির যাঁরা বিশেষজ্ঞ, ইংলণ্ডের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা আর ক'জন! তাঁরাই শুধু বুঝতে পেরেছেন যে সংবিধানের সংশোধনাবলী খেলার নিয়মগুলো পাল্টে দিয়েছে। এর পরে পার্লামেণ্টও থাকবে, ডেমোক্রাসীও থাকবে, থাকবে না শুধু পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী। যেখানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিসিয়ারি নেই, ফ্রী প্রেস নেই, সেখানে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীও নেই। যেখানে অপোজিশন পার্টিরা পার্লামেণ্টারি খেলায় সুফল না পেয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের খেলায় মাতে সেখানেও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী নেই। কতকাল লাগবে তাকে ফিরে পেতে!

গান্ধীজী থাকতেই গান্ধীপন্থী কর্মীদের সঙ্গেই আমার প্রধানতঃ যোগা-

যোগ। তাঁরাও আমাকে তাঁদের একজন মনে করেন। তবে তাঁদের স্বধর্ম ও আমার স্বধর্ম এক নয়। আমি কর্মী নই, স্রষ্টা। আমার সৃষ্টির কাজ বেশীদিন ফেলে রাখলে আমি আর সাহিত্যিক বলে গণ্য হতে পারিনে। কিন্তু আমার সাহিত্যের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি অহিংসাতত্ত্ব ও তার প্রয়োগ একান্ত আগ্রহের সঙ্গে অনুধাবন করেছি। এ বিষয়ে আমি গান্ধীজী থাকতেই লিখেছি, পরেও বার বার লিখেছি, ইচ্ছা আছে আরো বিশদভাবে লেখার। সুযোগ পেলেই আমি গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে মিশি। তাঁরাও আমার কাছে আসেন। তাঁদের একজন আমাকে একবার সর্বোদয়ের খসড়া ইস্তাহার দিয়ে যান পড়তে। তার উপর আমি এক দীর্ঘ মন্তব্য লিখি। খসড়া ও মন্তব্য ইংরেজীতে লেখা।

তাতে আমি যেসব কথা বলেছিলুম তার মর্ম বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আমাদের জীবনে একবারমাত্র উদয় হয়েছিল। সে সময় গ্রামে গ্রামে স্বাধীন ও স্বয়ংচালিত পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠতে পারত। যেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গজিয়ে উঠতে পারত সেটাকে আইন করে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। কিংবা সর্বোদয়কর্মীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সংগঠিত করতেও পারেন না। অগত্যা পার্লামেণ্টারি সংবিধানকেই মেনে চলতে হবে। কথায় কথায় সত্যাগ্রহ করা চলবে না। সত্যাগ্রহ করার অধিকার অবশ্য রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে নয়। নৈতিক কারণে। সর্বোদয় নেতারা হবেন নৈতিক নেতা। মরাল লীডার-শিপ তাঁদের উপরে ন্যস্ত। যুদ্ধকালে যদি কাউকে তার বিবেকের বিরুদ্ধে সৈন্যদলে যোগ দিতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে সেটা হবে সত্যাগ্রহের উপযুক্ত একটা হেতু। যতদিন না সেরকম কোনো হেতু উপস্থিত হচ্ছে ততদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে সত্যাগ্রহ করতে হবে না।

এই যখন আমার সুচিন্তিত অভিমত তখন আমি গুজরাটের ছাত্রদের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিয়ে মন্ত্রীমণ্ডল ও আইনসভা বিতাড়ন সমর্থন করতে পারিনে। তারই অনুকরণে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বিহারেও পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যত হয়েছেন শুনে আমি তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। বিহার সরকারকে তথা আইনসভাকে ওলটাতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকার তা সহ্য করবেন না। সেটা হবে তাঁদের সঙ্গেও বলপরীক্ষা। তেমন বলপরীক্ষা অহিংস থাকতে পারবে না। দেশ অহিংসার জন্যে প্রস্তুত নয়। জয়প্রকাশজী

যখন ছাত্রদের নিয়ে আন্দোলনে নামলেন তখন আমি আপনা হতেই মৌনব্রত নিলুম। ভারতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে লেখা বন্ধ করে দিলুম। কোন্ পক্ষ ঠিক, কোন্ পক্ষ বেঠিক, বিচার করা ছেড়ে দিলুম। কিছুদিন পরে বিনোবাজীও মৌনব্রত নেন। এখন তো তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে রাজনীতি নিয়ে তিনি আর একটি কথাও বলবেন না। কেউ যেন তাঁর অভিমত জানতে না চান।

মৌনভঙ্গ আমি করেছিলুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভয়াবহ নিধনে বজ্রাহত হয়। এপারে ওপারে কেউ একটি কথাও বলবেন না, এ মহাপাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, আমার এটা মানবোচিত মনে হয়নি। আমি আমার মানবিক কর্তব্য করেছি। কিন্তু ততদিনে এমারজেন্সী ও প্রিসেনসর-শিপ শুরু হয়ে গেছে। আমার লেখা ছাপতে দেওয়া হয় না কোনো পত্রিকায়। পরে ওটার সঙ্গে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে লেখা আরো কয়েকটি লেখা জুড়ে বই করে বার করে দিই। তারপর আবার আমি মৌনব্রতে ফিরে যাই। কিছুকাল পরে আবার এক বজ্রাঘাত। এবার খেলার মিয়ম বদল।

দেশের মরাল লিডারশিপ যাঁদের উপর ন্যস্ত আমি তাদের একজন নই। কিন্তু দেশের ইনটেলেকচুয়াল লীডারশিপ আর কেউ যদি না নেন তবে অগত্যা আমার মতো কয়েজনকে নিতে হবে। সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ দেখে আমরা কয়েকজন একটি সেমিনারে মিলিত হই। ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা গভীরভাবে বিবেচনার জন্যে আরো সময় চাই, সভাসমিতিতে আলোচনার জন্যে অবাধ স্বাধীনতা চাই, পত্রিকায় লেখালেখির জন্যে সেনসর-শিপ থেকে মুক্তি চাই, উপরন্তু অনুরোধ জানাই যে আমাদের মতামতের জন্যে অপেক্ষা না করে সাধারণ নির্বাচনটা ইতিমধ্যে সারা হোক। কিন্তু ফল হলো এই যে সংবিধানের সংশোধন তড়িৎ গতিতে সমাধা হলো। আর সাধারণ নির্বাচন আরো একবার স্থগিত রইল। যেটা পরে হবার কথা সেটা হলো আগে। যেটা আগে হবার কথা সেটা হবে পরে। কে জানে আরো ক'বার পেছিয়ে যাবে? আমরা বোধহয় ইণ্টেলেকচুয়াল নই, কিংবা হলেও আমাদের কোনো ওজন নেই। যদিও আমাদের দু'জন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি, একজন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল, একজন সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট, একজন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন লীগাল রিমেম্ব্রান্সার, একজন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান,

একজন পুরাতন অ্যাডভোকেট তথা আইন প্রসঙ্গে লিখনবিশারদ। কোন্‌জন আমি সটো কিন্তু বলব না।

সংশোধন বিলটি ইতিমধ্যে পাশ হয়ে গেছে। এখন সেটল্ড ফ্যাক্টকে আনসেটল্‌ করা সম্ভবপর নয়। তা হলেও লোকের জেনে রাখা উচিত যে আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। না করলে পরে কথা উঠত আমরা কেন ঘুমিয়েছিলুম। না, আমরা জেগেই ছিলুম। অপরকে জাগিয়েও দিয়েছি। হৈ চৈ করার আগেই যা হবার তা হয়ে গেল। যাঁদের আমরা ভোট দিয়ে পার্লামেণ্ট পাঠিয়েছিলুম তাঁরা পাঁচটি বছর কাবার করার পরেও আরো ক'বছর আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, জানিনে। ইতিমধ্যে আমাদের ম্যাণ্ডেট না চেয়ে নিয়ে আমাদের মৌল অধিকার খর্ব করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো, এটাও যখন পার্লামেণ্ট নামধেয় তখন এটাও সোভরেন। আর যেহেতু এটা সোভরেন সেহেতু আমরা যারা নির্বাচক তারা মৌল অধিকারের অনুপযুক্ত।

বিলেতের সত্যিকারের পার্লামেণ্টের যাঁরা সদস্য তাঁরা ছুটি পেলেই যে যার নির্বাচনকেন্দ্র ঘুরে বেড়ান, নির্বাচকদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেন, সভা ডাকেন, যারা প্রশ্ন করে তাদের বুঝিয়ে দেন। পাঁচবছরে একবার ভোট চাইতে আসাটা গণতন্ত্রের সব কথা নয়। অবসর পেলেই আসতে হয়। ভাব বিনিময় করতে হয়। সেটা করে ইংরেজরা, কারণ তারা জানে যে নির্বাচকরাই মালিক। করে না ভারতীয়রা, কারণ তারা জানে যে মালিক হচ্ছেন পার্টি হাইকমাণ্ড।

"ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অফ্‌ লিবার্টি।" (Eternal Vigilance is the Price of Liberty.) স্বাধীনতার মূল্য চিরজাগরূকতা। বলেছিলেন আইরিশ নেতা জন কারান (John Curran)। বাল্যকাল থেকেই এই আমার মটো। মাতৃভূমির স্বাধীনতার মতো চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাও আমার জন্মস্বত্ব। এর থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে আমি কি ভুলে যেতে ও ক্ষমা করতে পারি?

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

গুজরাটী অধ্যাপক বিষণ্ণ মুখে বললেন, "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের জীবনে আমরা শেষবারের মতো দেখেছি। আর দেখব না।"

তবু তো তাঁর মনে আশা ছিল যে নির্বাচন আবার একদিন হবে। কিন্তু মাসকয়েক পরে বাঙালী সলিসিটর হতাশভাবে বললেন, "নির্বাচন আর হবেই না।" ইতিমধ্যে দ্বিতীয়জনের হতাশা দূর হয়েছে। নির্বাচন হবে। অচিরেই হবে। তবে এখনো কারো কারো বিশ্বাস হচ্ছে না যে শেষমুহূর্তে হঠাৎ একদিন নির্বাচনের সিদ্ধান্ত রদ হবে না। সাধারণের মধ্যেও তেমন উৎসাহ লক্ষ করা যাচ্ছে না। উৎসাহটা অসাধারণদের মধ্যেই নিবদ্ধ।

এর কারণ কী? কারণ বহুজনের আশঙ্কা যে ভোট দিতে গিয়ে তাঁরা দেখবেন তাঁদের ভোট আর কেউ দিয়ে গেছে। প্রতিবাদ করে কোনো প্রতিকারও পাবেন না। আমার রজক তো আমাকে সাফ বলে দিয়েছে যে সে আর ভোট দিতে যাবে না। গেলে নাকি খুন হয়ে যাবে। ওকে যদি বলি যে ও একজন নাগরিক, নাগরিক অধিকার বলতে বোঝায় ভোট দেবারও অধিকার, বরং সেইটেই সর্বপ্রধান অধিকার, যা দিয়ে শাসক নির্বাচন করা যায়, ও বলবে, আমরা গরিব মানুষ, আমরা ওসব অধিকার-টধিকার বুঝিনে। ওসব বুঝবেন আপনারা। কে রাজা হবে তাতে আমাদের কী? আমরা খাজনা দেব।

এদেশের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে তাদের কর্তব্য কী তাই শুনে এসেছে। অধিকারের কথা কোনো শাস্ত্রেই লেখা নেই। যাতে লেখা আছে সেটা আইনের বই। আইন থাকলে আদালতও থাকে। আদালত থাকলে তার স্বাধীনতাও থাকে। কিন্তু এবার সংবিধান সংশোধন করে আমার

রঞ্জককে আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর দেশীয় রাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও। সেকালে প্রজাদের সকলের মুখে ওই একই কথা। কে রাজা হবে না হবে তাতে আমাদের কী? আমরা খাজনা দেব।

এই যে মধ্যযুগীয় প্রাচ্য মানসিকতা এটা পাশ্চাত্য দেশেও ছিল। কিন্তু তিন শতাব্দী আগে কেমন করে বদলে যায়। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা প্রথম চার্লস যখন তাঁর ঈশ্বরদত্ত অধিকার অনুসারে খাজনা ধার্য করেন তখন প্রজাপ্রতিনিধিরা রব তোলেন, "নো ট্যাকসেশন উইদাউট রিপ্রেজেনটেশন।" প্রতিনিধিত্ব বিনা খাজনা ধার্য করা চলবে না। আগে প্রতিনিধিদের মত নাও, তার পরে খাজনা ধার্য করতে হয় করো। মত মানে ভোট। আগে ভোট গণনা করতে হবে।

রাজা চার্লস এ তত্ত্ব মানতে নারাজ। প্রতিনিধিসভাও রাজকীয় অধিকার তত্ত্ব মানতে নারাজ। দু'পক্ষেই যুদ্ধং দেহি। গৃহযুদ্ধ। নৃপতির শিরশ্ছেদ। প্রজারাই জেতে। কিন্তু পরে তারাই আবার যুবরাজকে সিংহাসনে বসায় ও তখন থেকে হয় রাজভক্ত প্রজা। রাজাও প্রজাপ্রতিনিধিদের মত না নিয়ে খাজনা ধার্য করেন না। ধার্য যা করার তা প্রতিনিধিসভাই করে। রাজা সায় দেন।

এরই নাম পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী। পার্লামেন্টে যে দলটির প্রাধান্য সেই দলের নেতারাই রাজমন্ত্রী হন। তাঁদের যিনি প্রধান তিনিই প্রধানমন্ত্রী। কার্যত তিনিই রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্যে দায়ী। সেইজন্যে তাঁরই ক্ষমতা সকলের চেয়ে বেশী। তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন। সর্বশক্তিমান ছিলেন প্রজাপক্ষের সেনাপতি ক্রমওয়েল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সর্বশক্তিমানের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। তাঁর পুত্র তাঁর আসনে বসলেও তেমন যোগ্য ছিলেন না। ইংলণ্ডের অলিখিত সংবিধান এমনভাবে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে যে রাজা তো ননই পার্লামেন্টও সর্বশক্তিমান নয়। যদিও সে বলে যে সে সোভরেন তবু রাজাকেই বলা হয় সোভরেন ও রাজার কাছেই সৈন্যদের আনুগত্য।

প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার তখনকার দিনে বড়লোকদেরই ছিল। গরীবদের ছিল না। মধ্যবিত্ত বলে কোনো শ্রেণীই ছিল না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে এখন ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সর্বসাধারণের হয়েছে। তেমনি গ্রেট ব্রিটেন থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে। এর জন্যে লড়তেও হয়েছে কোনো কোনো দেশকে।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলকথা ছিল 'নো ট্যাকসেশন উইদাউট রিপ্রেজেনটেশন।' স্বাধীনতা অর্জনের পর মার্কিনরা আর গ্রেট ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানের অনুসরণ করে না। নিজেদের উপযোগী একটা লিখিত সংবিধান রচনা করে। তাতে রাজার স্থান নেন প্রেসিডেন্ট, পার্লামেন্টের স্থান নেয় কংগ্রেস, বিচারকদের নিয়ে গঠিত সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয় প্রেসিডেন্টের তথা কংগ্রেসের সঙ্গে সমান ক্ষমতা। কেন্দ্রের নিচে থাকে বহুসংখ্যক স্বয়ংশাসিত স্টেট। তাদের ক্ষমতা কেন্দ্রের সমান না হলেও এত বেশী যে এদেশে তার তুলনা নেই।

ভারতের জন্যে সংবিধান রচনা ইংরেজরাই আরম্ভ করেছিল। তাদের শেষ কীর্তি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। কিন্তু যে দেশ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে সে দেশ পরের তৈরী সংবিধানে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাই সে তার নিজের উপযোগী একটি লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করে। ছাঁচটা যদিও ভারত শাসন আইনের তবু এর বৈশিষ্ট্য কম নয়। এই সংবিধান অনুসারে বারবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, কেন্দ্রে তথা বিভিন্ন রাজ্যে। এ নিয়ম বরাবরের জন্যে বন্ধ হতে পারে না। তবে আপৎকালে স্থগিত থাকতে পারে। আপৎকালীন অবস্থার জন্যে একবছর স্থগিত ছিল। এখন আপৎ-কালীন অবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাঙালী সলিসিটরের ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলো, কিন্তু বাঙালী রজক তথা গুজরাটী অধ্যাপকের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হয়নি। কোথায় পশ্চিমবঙ্গ আর কোথায় গুজরাট? কারচুপির অভিযোগ দুই রাজ্যেই। মারামারির কথাও শোনা যায়। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য সে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নয়। আর উচ্চ যেথা শির সে দেশও আপৎকালীন ভারত নয়। আমাদের সবাইকে মাথা হেঁট করতে হয় এক মহাপ্রাজ্ঞ সেনসর মহারাজের কাছে। সবার উপরে সেনসর সত্য তাহার উপরে নাই। তা তুমি যত বড়ো লেখকই হও না কেন। বিরোধ বেধেছিল আসলে শাসকপক্ষের সঙ্গে বিরোধীপক্ষের। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমরাই উলুখাগড়া। আমরা যারা স্বাধীন লেখক, কোনো পক্ষেই কমিটেড নই। একমাত্র সরস্বতীর কাছেই কমিটেড। কাদের জন্যে ভারত জগৎসভায় গর্ববোধ করবে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কারা তার প্রতিনিধিত্ব করবে, দেশের লেখকদের যদি হয় দেশের মাটিতেই মাথা হেঁট? ফরাসী দেশের আপৎকালীন অবস্থায় কেউ কি কল্পনা করতে

পারেন সারত্রের বা কামুর অনুরূপ অবস্থা? শুধুমাত্র মতের অমিলের জন্যে একটা স্বাধীন দেশের লেখককে বিনা বিচারে আটক করা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর নিদর্শন নয়। ওসব ঘটে পীপলস ডেমোক্রাসীতে বা সগুস্বাধীন অর্ধসভ্য দেশে। ব্রিটিশ শাসনেও কখনো কোনো লেখককে শুধুমাত্র মত প্রকাশের জন্য বিনা বিচারে আটক করা হয়নি। এসব কথা বলছি এজন্যে যে সামনের নির্বাচনে লেখকদেরও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। তাঁরাও নাগরিক, তাঁরাও করদাতা, তাঁদেরও ভোটদানের তথা ভোট প্রার্থনার অধিকার আছে। সে অধিকার তাঁরা আর দশজনের মতোই নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী খাটাবেন। কে যে কোন দলকে ভোট দেবেন তা বলা যায় না। কেউ যদি ইচ্ছা করেন তাঁর সমর্থিত প্রার্থীর অনুকূলে স্বাধীনভাবে লিখতে কিংবা বলতেও পারেন। যেমন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে হয়।

আমরা এমন কোনো অসাধারণ অধিকার দাবী করছিনে যে অধিকার নির্বাচনকালে ইংরেজ বা ফরাসী বা মার্কিন লেখকদের নেই বা যে অধিকার বিগত নির্বাচনকালে আমাদের নিজেদেরই ছিল না। অথচ আমরা মুখ ফুটে দাবী করতে সাহস পাচ্ছিনে, কারণ আপৎকালীন ব্যবস্থা এখনো রহিত হয়নি। আপৎকালীন ব্যবস্থাই যদি নিয়ামক হয় তবে নির্বাচনের প্রহসন কেন? আর নির্বাচনই যদি জনগণের মৌল অধিকার হয় তবে আপৎকালীন ব্যবস্থার আতঙ্ক কেন? অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য চাই ঝণ্ট রজককে অভয়দান। গুজরাটী অধ্যাপককেও, বাঙালী সাহিত্যিককেও। মৌখিক অভয়ের কোনো মূল্য নেই। কারণ ছাত্রদের র‍্যাগিং আর মস্তানদের রিগিং এখন বিষবৃক্ষের মতো দৃঢ়মূল হয়েছে। মূলোচ্ছেদ করার জন্যে চাই সাহস আর সময় আর ইচ্ছা। কর্তাদের মনে কী আছে তাঁরাই জানেন। আমরা বুদ্ধিজীবীরা অসহায়।

জোর গুজব, নির্বাচনের পর থেকে আবার কড়া সেনসরশিপ। তা যদি হয় তবে আমার হাতে এক মাস সময়। যা বলবার তা এখুনি প্রাণ খুলে বলে নিতে হবে। আমার প্রথম কথাটা হচ্ছে এই যে ভারতের মতো দেশে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী হচ্ছে লাইফবোট। সবাইকে আমার করজোড়ে নিবেদন, এ লাইফবোটকে আপনারা সময় থাকতে জড়িয়ে ধরুন। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর লাইফবোটটি যদি না থাকে তবে আমাদের কপালেও আছে বাংলাদেশের মতো সামরিক শাসন। সামরিক শাসনও

যদি ফেল করে তবে রক্তাক্ত বিপ্লব। আমাদের বিপ্লববাদী বন্ধুরা হয়তো ভাবছেন তা হলে তো ভালোই হয়, সেই তো তাঁদের মওকা। কিন্তু এমন অঙ্গীকার কে তাঁদের দিয়েছে যে প্রতিবিপ্লবে তাঁরা ঝাড়ে মূলে বিনষ্ট হবেন না? প্রতিবিপ্লবীদের না হয়, পরাস্ত করলেন, কিন্তু অতিবিপ্লবীদের নিয়ে করবেন কী? চারজন মাত্র অতিবিপ্লবী মিলে আশি কোটি লোকের দেশে কী কাণ্ডটাই না করছে! আমরা তো শুনছি চিয়াং চিং পরলোকগত চিয়াং কাই-শেকের চেয়েও প্রবল শত্রু।

পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর হাজার দোষ, কিন্তু অন্ততপক্ষে একটি গুণ আছে। ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানোর জন্যে রক্তাক্ত বিপ্লবের দরকার হয় না। দরকার হয় না অহিংস বিদ্রোহের। যার অপর নাম গণসত্যাগ্রহ। মিলিটারি ক্যু? তারই বা কী দরকার? আমেরিকার নিয়ম চার বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন হবেই। ঘোর বিপদের দিনে বিবাহও পিছিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নির্বাচন পিছিয়ে দেবার ক্ষমতা কোনো মানুষকেই দেওয়া হয়নি। মার্কিন সংবিধান অপৌরুষের। ব্রিটেনে অবশ্য পিছিয়েও দেওয়া যায়, এগিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু লোকে সব সময় নজর রাখে আবহাওয়ার উপরে। ওয়েদার ফোরকাস্টের মতো নির্বাচনের ফোরকাস্টও ওদের দৈনন্দিন পথ্য। হঠাৎ একদিন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে অপোজিশনকে প্রস্তুত করা অসম্ভব। এরা চলে ডালে ডালে তো ওরা চলে পাতায় পাতায়। তবে, হ্যাঁ, এটা একটা অজানা খেলা বটে। ক্ষমতার হস্তান্তর অসময়ে ঘটানোর জন্যে অপোজিশন জিগীর ছাড়ছে, "প্রধানমন্ত্রী, গদী ছাড়ো, নয়তো অমুক তারিখ থেকে গণসত্যাগ্রহ।" আর নোটিশ পেয়ে প্রধানমন্ত্রী করছেন আগে ভাগে এমারজেন্সী ঘোষণা ও আচমকা গ্রেপ্তার। আর আমরা যারা এটাও পছন্দ করিনে, ওটাও পছন্দ করিনে, তারা শুধু হতভম্ব হয়ে দেখছি যে, এক এক করে সবকটা অধিকারই হারিয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজ খবর যা ছাপে তা একতরফা, মন্তব্য যা বেরোয় তাও অবিকৃত নয়। আমরা তো কোথাও ঠাঁই পাইনে। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এটা একটা নিষ্প্রদীপ। সামান্য লিটল ম্যাগাজিন! কজনই বা তার পাঠক। তারও কণ্ঠরোধ। সম্পাদক ফেরার, পরে বন্দী।

এমারজেন্সীর প্রয়োজন ছিল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ যখন সম্পূর্ণ হয়েছে তখন শোনা গেল এমারজেন্সীর

প্রয়োজন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির জন্যে। অর্থনৈতিক ও ও সামাজিক প্রগতি কে না চায়! কিন্তু সেটা কি এক আধ বছরের ব্যাপার? তার জন্যে তো দশ বিশ বছরও যথেষ্ট নয়। তাহলে কি দশ বিশ বছর ধরে এমারজেন্সী বহাল থাকবে? দুর্ভাবনার কথা বইকি? একদিন সত্যি সত্যিই দেখা গেল এমারজেন্সীকে চিরস্থায়ী করার জন্যে সংবিধান সংশোধন করার তোড়জোড় চলেছে। আমরা যারা আইনকানুন নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি তারা সংশোধনের ধারাগুলো পরীক্ষা করার জন্যে সময় চাই। ধারার সংখ্যা উনষাট, কিন্তু আমাদের উনষাট দিনও সময় দেওয়া হলো না। সংশোধন আইন রাতারাতি পাশ হয়ে গেল।

এতে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীকে সবল করার নামে দুর্বলই করা হয়েছে। দেশের লোকের যেদিন ঘুম ভাঙবে সেদিন তারা দেখবে যে আস্তাবল খালি, ঘোড়া চুরি গেছে। যে সিসটেম এশিয়ার আর কোনো দেশে নেই, জাপানে আরো পরে প্রবর্তিত হয় ও এখনো কাঁচা, সে সিসটেম ভারতে আছে ও শতাব্দীকাল ধরে বিবর্তিত হতে হতে এখন আধপাকা।

অভয় পেলে ঝণ্টু রজক, গুজরাটী অধ্যাপক ও বাঙালী সাহিত্যিক হয়তো স্বাধীনভাবে কোনো একটি পক্ষের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। আমি কিন্তু স্বাধীনতার নিশ্চিতি পেলেও মনঃস্থির করতে পারব না। কারণ কংগ্রেসকে যদি ভোট দিই তবে তার অর্থ হবে এই যে আমি সংবিধানের এই সংশোধন সমর্থন করি। সংবিধানের এই সংশোধন সমর্থন করার অর্থ এমারজেন্সীকেই প্রকারান্তরে চিরস্থায়ী করা। আমি পার্লামেণ্টে ছিলুম না। থাকলে এই সংশোধনের পক্ষে ভোট দিতুম না। এখন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে সেই জিনিসের পক্ষেই কি ভোট দেব? কংগ্রেস অনেক সৎকাজ করেছে। বরাবরই আমি তার পক্ষপাতী। কিন্তু এমন করে আমাকে দিয়ে এই সংবিধান সংশোধন সমর্থন করিয়ে নিতে চাইলে আমি রাজী হই কী করে?

পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষের প্রার্থীকে ভোট দিলে স্টেবল গভর্নমেণ্ট থাকবে কি না বলা শক্ত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে এতকাল ধরে ছিল তার কারণ সেটা ছিল স্টেবল গভর্নমেণ্ট। কংগ্রেস গভর্নমেণ্টও যে এতকাল ধরে আছে তার কারণও সেই একই। নির্বাচনের উদ্দেশ্য যদি হয় ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটানো তবে আমি তার জন্যে প্রস্তুত নই। তবে এটাও আমি দীর্ঘকাল ধরে অনুভব করছি যে কংগ্রেসের একটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ চাই। বিলেতের

কনসারভেটিভ পার্টির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যেমন লেবার পার্টি, আমেরিকার রেপাবলিকান পার্টির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যেমন ডেমোক্রাটিক পার্টি। হরেক কিসমের বিরোধী দল মিলে অপোজিশনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু গভর্নমেণ্টের কাজ চালাতে পারে না। আমাদের পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর দুর্বলতা এইখানে যে কংগ্রেস যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় তাহলে তার বিকল্প হবে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট। কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট টঁ্যাকসই হবে না। হলে অখণ্ড ভারত দ্বিখণ্ড হতো না। প্রধানমন্ত্রী যে দেশের ঐক্যনাশের আশঙ্কা করছেন সে আশঙ্কা অমূলক নয়। সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। কোয়ালিশন এড়াতে হলে কোনো একটি পার্টিকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে। এতকাল কংগ্রেসই সেটা পেরেছে। গভর্নমেণ্ট গঠনের বেলা কংগ্রেসের কোনো বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে শক্তিশালী একটা বিরোধীপক্ষও বিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সেটা দেশেরই স্বার্থে। তথা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীরও স্বার্থে। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এটি একটি আবশ্যিক পদক্ষেপ। কিন্তু এর একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে বিরোধীপক্ষকে ডাইরেকট অ্যাকশন পরিত্যাগ করতে হবে। সহিংস বিপ্লব তো নিশ্চয়ই, গণসত্যাগ্রহও পরিত্যাজ্য।

বিচারকের রায় ও জনগণের রায়

এমারজেন্সী উঠে গেল। আমিও ফিরে পেলুম আমার কথা বলার স্বাধীনতা। যেসব কথা দেড বছর ধরে বলি বলি করে বলতে পারিনি, বললে আমারও পরিত্রাণ ছিল না, সে সব আজ আমি নির্ভয়ে বলতে চাই। পরে যারা আসবে তারা জানবে আমি কী ভেবেছি, প্রকাশ করতে না পেরে কী বেদনা বহন করেছি।

নির্বাচনে কারচুপি নতুন কিছু নয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথও অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁকে আমেরিকার টামানি হলের মতো অনাচার দিয়ে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন ভারত সেটা বন্ধ করার জন্যে একটা আইন পাশ করে। দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, চেন্না রেড্ডি প্রমুখ প্রবীণ জননায়করাও নির্বাচন সংক্রান্ত অনাচারের জন্যে ছয় বছরের জন্যে নির্বাচনে যোগদানের অযোগ্য বলে ঘোষিত হন। কেন যে ওটাকে সব ক্ষেত্রেই ছয় বছর করা হলো তা আমি জানিনে। আমি হলে কারো কারো ক্ষেত্রে কম কারো কারো ক্ষেত্রে বেশী করতে পারতুম। অনাচার সকলের বেলা সমান গুরুতর নয়। লঘু পাপে গুরুদণ্ড কখনো সমর্থন করা যায় না। সেই জন্যে আমি যখন শুনি যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে অনাচারের প্রমাণ পেয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহ তাঁকে ছয় বছরের জন্যে নির্বাচনে যোগদানের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন তখন আমি বিশেষ দুঃখিত হই। অনাচারের বিবেচনায় ছয় বছর নিশ্চয়ই গুরুদণ্ড। আমি হলে ওটাকে ছয় বছরের জায়গায় ছয় মাস করতুম। ছয় মাসের পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবার নির্বাচনে দাঁড়াতে পারতেন ও পার্লামেন্টের লোকসভার

সভ্য হতে পারতেন। ওটা একটা ক্রাইম নয়। ওর সঙ্গে মরাল টারপিটিউড জড়িত নয়।

তবে এটাও ঠিক যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যে অথরিটি সে অথরিটি আমার দেওয়া লঘু দণ্ডের দ্বারাও খর্ব হতো। তাঁকে ছয় মাসের সাজা থেকেও বাঁচাতে পারতেন চীফ ইলেকশন কমিশনার। তাঁর কাছে আবেদন করলে তিনি ওই মেয়াদটা একেবারেই মুছে দিতে পারতেন। তবে আরেকবার নির্বাচনে দাঁড়াতে বাধ্য করতেন। রায়বেরেলী নয়, অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে। রায়বেরেলীর নির্বাচনটা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিপক্ষেই গেছে বলে ধরে নেওয়া হতো। সেখানে বিচারপতির রায়ই চূড়ান্ত। যদি না আপীলে সে রায় নাকচ হতো। সেরূপ সম্ভাবনা যে ছিল না তা নয়। না থাকলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতেনই বা কেন আর সুপ্রীম কোর্টের ছুটির সময় ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার সে আপীল শুনানীর জন্যে গ্রহণ করতেনই বা কেন?

আপীল দায়ের করা হয়েছে, যথাকালে বিচারপতিদের সামনে শুনানী হবে, ফলাফল কী হবে তা অনিশ্চিত, এমন সময় ঘোষণা করে দেওয়া হলো এমারজেন্সী। কারণ প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী পক্ষ দাবী করলেন যে, বিচার-ফলের জন্যে অপেক্ষা না করে তাঁকে গদী ছাড়তে হবে। নয়তো অমুক তারিখ থেকে গণসত্যাগ্রহ। গণসত্যাগ্রহ এ দেশের ইতিহাসে অজ্ঞাত নয়। নেতারা সাবধান না হলে জনতা হিংসার আশ্রয় নিতে পারে, পুলিশও কারণে অকারণে গুলী চালাতে পারে। অমন একটা পরিস্থিতি নিবারণ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কই, কখনো তো এমারজেন্সী ঘোষণা করে নিবারণ করতে দেখিনি? সালটা বোধহয় ১৯৪৯। কমিউনিস্ট নেতা রণদিবে এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ করেন। সরকার তার আগেই আঘাত হানেন। তখন তো এমারজেন্সী ঘোষণা করতে হয়নি। পাইকারী হারে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। আন্দোলন দমন করার পর তাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে। ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ কি না, ছেড়ে দিলে কাকে কাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত এর জন্যে সরকার থেকে দু'জন সিনিয়র সেসনস জজের পরামর্শ চাওয়া হয়। নথিপত্র যা দাখিল করা হয় তা দেখে জজ দু'জন তো অবাক। যে ঘটনা ১৯৪৯ সালে ঘটতে যাচ্ছিল সে ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব ঘটনার কথা তাঁদের সামনে হাজির করা হয়। সেসব হয়তো দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পূর্বেকার। যার জন্যে ওরা হয়তো আগেই সাজা পেয়েছে। এগুলো বাচ্চাদের সম্বন্ধে শোনা গেল যে, তারাই সব চেয়ে বিপজ্জনক। কারণ বিপ্লবের বার্তা তারা নাকি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ছড়ায়। .

বিপ্লবের আসন্নতায় যখন হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত তখনো এমারজেন্সীর প্রয়োজন হয়নি। 'গদী ছাড়ো' আন্দোলনটা এমন কী সাংঘাতিক যে, এমারজেন্সী ঘোষণা করা একান্ত আবশ্যক ছিল? সেটা না হয় সরকারের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলুম, কিন্তু খবরের উপর ও বক্তব্যের উপর প্রি-সেনসরশিপ মেনে নিই কী করে? আমার বন্ধু এক ঝানু আই সি এস অনেক বড়ো বড়ো পদে কাজ করে নাম করেছেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, 'ব্রিটিশ আমলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও আমরা প্রি-সেনসরশিপ দেখিনি। আপনি এর বিরুদ্ধে লিখবেন না?' আমি বলি, 'লিখলে ছাপবে কে?' তিনি স্বীকার করেন যে, কেউ ছাপবে না। আপসোস করে বলেন, 'তা হলে কি রাশিয়ার মতো এদেশে সামিজাত সাহিত্য হবে?' সত্যি তাই হলো। সামিজাত সাহিত্য দেশের নানা স্থানে গজিয়ে উঠল।

এমারজেন্সী সহ্য করলেও প্রি-সেনসরশিপ আমি সহ্য করিনি। রাজনীতির সঙ্গে সংস্রব নেই এমন রচনাও সেনসরকে দিয়ে পাশ করিয়ে না নিলে ছাপা হতো না। তিনি তাঁর খুশিমতো কাটতেন। গল্পের মর্মটাই বাদ পড়ত। সাহিত্যিকদের উপর এই অহেতুক জুলুমের বিরুদ্ধে আমাদের পি ই এন থেকে প্রতিবাদ করা হয়। ফল যে একেবারে হয় না তা নয়। কিন্তু যারা সরকার বা সরকার-বিরোধী কোনো পক্ষের লোক নয়, যে যার নিজের কাজ করে যাচ্ছে, তাদের কেন জোর করে রাজদ্বারে টেনে নিয়ে গিয়ে অনুগ্রহ চাইতে বাধ্য করা? আমি লেখা বন্ধ করে দিই। কিন্তু একজন লেখক যদি লেখা বন্ধ করে দেয় তা হলে সে আর লেখকপদবাচ্য থাকে না। পাঠকও তাকে ভুলে যায়। তার যদি কিছু বলবার থাকে তবে তা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। এমন অত্যাচার তো আগে কেউ করেননি। অথচ এই নিয়ে হৈ চৈ বাধাতে গেলে নির্ঘাত বিনা বিচারে আটক। এবার আর দু'জন সেসনস জজের কাছে নথিপত্র যাবে না। সরকার জজদের বোধহয় পরামর্শ চান না।

লক্ষ্য করা গেল যে, বিচারপতি জগমোহনলাল সিংহের উপর খোদকারী করলেন কিনা পার্লামেন্টের সদস্যরা। তাঁরা আইনজ্ঞ নন। কখনো বিচার কার্য করেন নি। বিচারটা ঠিক হয়েছিল না ভুল হয়েছিল তাঁরা এ প্রশ্নের

উত্তরই দিলেন না। এমন একটা আইন পাশ করে দিলেন যার ফলে নির্বাচনের আদি অন্ত নস্যাৎ হয়ে গেল। যেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে শ্রীরাজনারায়ণ আদালতে দরখাস্তই করেননি। সমস্তটাই মায়া। দরখাস্তটা যাঁর বিরুদ্ধে হয়েছিল তিনি একজন সদস্য পদপ্রার্থী। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি আদালতে বিচারাধীন নন। কিন্তু পার্লামেণ্ট দেখল কেবল তাঁর প্রধানমন্ত্রী পরিচয়টাই। যেমন করেই হোক প্রধানমন্ত্রীকে আদালতের দায় থেকে মুক্ত করতেই হবে। এর জন্যে একটা আজব তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হলো। পার্লামেণ্ট নাকি আদালতের উর্ধ্বে। যেহেতু সদস্যরা নির্বাচিত লোকপ্রতিনিধি। পার্লামেণ্টের এ দাবী মেনে নিলে কোনো মামলাই আদালতে নিবদ্ধ থাকবে না। যে পারবে সে ওটাকে পার্লামেণ্টে নিয়ে যাবে। সদস্যরা ভোটের জোরে আদালতের রায় উল্টিয়ে দেবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আপীল যখন সুপ্রীম কোর্টে শুনানীর জন্যে ওঠে তার আগেই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। বিচারপতিরা পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্তই মেনে নিতে বাধ্য হন। শ্রীরাজনারায়ণ সুপ্রীম কোর্টে বিচার পান না। তাঁকে জেলে পচতে হয় এমারজেন্সীর প্রকোপে। তারপর রেডিওতে শুনি রায়বেরেলীর জনগণের সুপ্রীম কোর্ট এবারকার নির্বাচনে তাঁকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে অনেক বেশী ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিয়েছে। হয়তো এ রায়কেও রদ করার চেষ্টা হতো আরো একবার পার্লামেণ্টে।

ইন্দিরাজীর জন্যে আমি দুঃখিত, কিন্তু কংগ্রেসের জন্যে নই। কংগ্রেসের যেসব সদস্য পার্লামেণ্টে গেছলেন তাঁদের মাথায় ঘুরছিল কেমন করে তাঁরা আদালতের উপর খোদকারী করবেন। এর মতো বিপজ্জনক তত্ত্ব আর নেই। ইতিমধ্যেই এঁরা এঁদের খুশিমতো সংবিধান সংশোধন করিয়ে নিয়েছেন। কাজটা এমন তড়িঘড়ি হয়েছে যে, দেশবাসীকে ভেবে দেখবারও সময় দেওয়া হয়নি এতে কার কী লাভ হলো। মনে হয় এমারজেন্সী তুলে দেবার আগে সেটাকে প্রকারান্তরে কায়েম করাই উদ্দেশ্য। তা হলে কি 'কংগ্রেসের শাসনও সেইসূত্রে কায়েম হতে চেয়েছিল? গায়ের জোরে কায়েম হতে চাওয়ার মতো ভোটের জোরে কায়েম হতে চাওয়াও অন্যায়, যদি না সে ভোট হয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট। এবারকার নির্বাচনে দেখা গেল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট কংগ্রেসের পক্ষে নয়, কংগ্রেসের বিপক্ষে।

অথচ কংগ্রেসের মতো সঙ্ঘশক্তি আর কোনো দলেরই নেই। একমাত্র

সন্যদলই তার মতো সঙ্ঘবদ্ধ। , কংগ্রেসের সঙ্ঘশক্তি ক্ষয় হলে সৈন্যদলই তার শূন্যতা পূরণ করতে পারে। এটাও একটা বিপজ্জনক তত্ত্ব। কংগ্রেসের প্রয়োজন এখনো মেটেনি। কংগ্রেস ভেঙে গেলে ভারতও ভেঙে যেতে পারে ও সেটা নিবারণ করার জন্যে সৈন্যদল এগিয়ে আসতে পারে। যার এত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা সে যদি তার কর্তব্য ঠিকমতো করত তা হলে তার এ পতন হতো না। তার পতনের জন্যে ইন্দিরাজীর দায়িত্ব যতখানি তার চেয়ে শতগুণ বেশী সেই সব পার্ষদ ও সভাসদের যাঁরা তাঁকে বুঝিয়েছেন যে, আদালতের রায়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়। রাজ্য-সভা তো এমন এক প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারের সাত খুন মাফ। এঁরা আইনের ঊর্ধ্বে। তাই যদি হলো তবে আইনের শাসন রইল কোথায়? আইনের মূল কথা তুমি যত বড়োই হও না কেন আইন তোমার চেয়েও বড়ো। আইন তৈরি করার জন্যেই নির্বাচিত সদস্যরা পার্লামেণ্টে যান। অথচ আইনের শাসনকে তাঁরাই মর্জিমতো লঙ্ঘন করেছেন। এটা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। জনগণ তাঁদের উচিত শিক্ষাই দিয়েছে। দীর্ঘকাল প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই পার্ষদ তথা সভাসদদের।

আর ইন্দিরাজী? তাঁকে তো সেই ছয় বছরই অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য। আগে ছিল পাঁচ বছর পরে নির্বাচন। এখন হয়েছে ছয় বছর পরে নির্বাচন। এটা যেন বিচারপতি জগমোহনলাল্ সিংহের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করা হয়েছে। ছয় বছর বাইরে থাকা এমন কিছু অসাধারণ ঘটনা নয়। ইংলণ্ডের লোককে যিনি হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করেন, যাঁর কাছে তাঁরা চির কৃতজ্ঞ, যুদ্ধজয়ের পর সেই চার্চিলকেও হারিয়ে দেয় এক অখ্যাত নির্বাচনপ্রার্থী। তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় পাঁচ বছর। গণতান্ত্রিক দেশে একটানা সতেরো বছর না এগারো বছর কোনো প্রধান-মন্ত্রীকেই টিকতে দেওয়া হয় না। জবাহরলাল ও ইন্দিরাজী হচ্ছেন ব্যতিক্রম। ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে মনে হয় না। আমেরিকার মতো নিয়ম করে দিতে হবে যে কারো কার্যকাল একটানা আট বছর অতিক্রম করবে না।

একজন বিচারপতি যে আদেশ দেন তাঁর ঊর্ধ্বতন বিচারপতি যদি সে আদেশ রদবদল না করেন তবে সে আদেশ বলবৎ থাকে। পার্লামেণ্ট অযথা

হস্তক্ষেপ করেছে। নতুন সদস্যরা যেন সে বিধান প্রত্যাহার করেন। তারপরে আইনে যা বলে তাই হবে। বিচার যথারীতি হবে। ফলাফল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেও যেতে পারে।

জুডিসিয়ারির কাঁধে পা রেখে দাঁড়াবে পার্লামেন্ট, পার্লামেন্টের কাঁধে পা রেখে দাঁড়াবেন প্রাইম মিনিস্টার। আর প্রেসিডেন্ট বলে একজনের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি হবেন কার্যত প্রাইম মিনিস্টারের ডামি। এই যে ব্যবস্থা এটা একটা আজব সার্কাস। একটিমাত্র ব্যক্তির উপরে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত না করলে এ সার্কাস সফল হতে পারে না। আর তিনি যে অমর বা অভ্রান্ত তাও নয়। আমাদের বরাত ভালো যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সাধারণ নির্বাচন এক বছর স্থগিত রাখলেও আর এক বছর মুলতুবি রাখার সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন। তার ফলেই জানতে পারলেন জনগণ কী চায়। সেটা যদি তিনি না করতেন তবে জনগণ একদিন বিদ্রোহ করত ও সে বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে সৈন্য-দলকে আহ্বান করতে হতো। সৈন্যদল জনতাকে গুলী না করে হয়তো সার্কাসের অবসান ঘটাত। সর্বময় ক্ষমতা চলে যেত সৈন্যদলের হাতে। সেনানায়করাই হতেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অনেকগুলি মাথা গড়াগড়ি যেত।

ভালোই হয়েছে যে, কারো মুণ্ডপাত হয়নি। বিনা রক্তপাতেই ঘটে গেছে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এর মুখ্য অধিনায়ক শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। সারা উত্তর ভারত জুড়ে তাঁর নৈতিক প্রভাব। তাই সারা উত্তর ভারত থেকে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি সদস্যদল বিতাড়িত। ইচ্ছা করলে জয়প্রকাশজী স্বয়ং শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারতেন। সে কাজে তাঁর আগ্রহ নেই। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো বাইরে থেকে পরামর্শ দেবেন। পরামর্শ না শুনলে সমালোচনা করবেন। আমরা আবার ত্রিশ বছর আগেকার সেই অলিখিত সমঝোতায় ফিরে যাচ্ছি। যে সমঝোতা অনুসারে ক্ষমতার দায়িত্ব নিতেও একজন নেতা, নীতিনির্দেশের দায়িত্ব নিতেন অন্য একজন বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী। এটাও একান্তভাবে ব্যক্তিনির্ভর। সেই ব্যক্তিও অমর বা অভ্রান্ত নন। বর্তমান নির্বাচনের পশ্চাতেও রয়েছে মহান এক ব্যক্তিত্বের তিন-চার বছর ব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, কারাবাস ও কালব্যাধি। তিনি আর কতদিন বাঁচবেন তাও বলা যায় না।

এখনো আমাদের গণতন্ত্র একজন মহাত্মা বা মহানায়কের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তেমন মানুষ তো সব সময় পাওয়া যায় না।

যাঁদের পাওয়া যায় তাঁদের সময়ে গণতন্ত্র চালানোর জন্যে তৈরি হতে হবে। যেমন হয়েছে আমেরিকার ও ইংলণ্ডের জনগণ। কাজটা অত্যন্ত দুরূহ বলে যদি একজন সর্বময় কর্তার উপর সমস্ত দায়দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তা হলে তার পরিণাম কী হবে তা এই এমারজেন্সীর সময় হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা গেল। দেশের লোক এবারকার মতো পরিত্রাণ পেয়েছে বলে চিরকালের মতো পেয়েছে তা নয়। সমস্তক্ষণ পাহারা রাখতে হবে। জাগ্রত থাকতে হবে। গণতন্ত্রের দায়দায়িত্ব কেবল কয়েকজন নেতার নয়, সর্বসাধারণের। বিশেষ করে আইনজীবী, সাংবাদিক ও চিন্তাশীলদের। যাঁদের এককথায় বলা হয় বুদ্ধিজীবী। এঁরাও যদি কর্তাভজা হন তবে গণতন্ত্রের ঠাট বজায় থাকলেও গণতন্ত্র থাকে না। বিষ নজরে পড়ার ঝুঁকি সব সময়েই নিতে হবে। এককভাবে সেটা নেওয়া শক্ত। তাই সমিতিবদ্ধ হতে হবে। একজনের বিপদে আপদে আর একজন বা আরো কয়েকজন পাশে দাঁড়াবেন। এবার আমরা লক্ষ্য করলাম যে, ঝুকি নেবার মতো মানুষ যদি বা আছেন পাশে দাঁড়াবার মতো মানুষ খুব বেশী নেই। ব্রিটিশ আমলে ছিলেন অনেক বেশী।

নতুন সরকারকে আমরা সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাব। সকলের সহানুভূতি নিয়েই তাঁদের যাত্রারম্ভ। পথের মাঝখানে যেন তাঁদের এমন মতিভ্রম না হয় যে দলের লোকগুলিই আসল, সর্বসাধারণ আসল নয়। কংগ্রেসও তো সকলের সহানুভূতি নিয়ে যাত্রারম্ভ করেছিল। রাখতে পারল না কেন? দলীয় স্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ তার মাথা ঘুরিয়ে দিল। দেশটা যেন তার জায়গীরদারদের জমিদারি। নাগরিকরা যেন তার বা তাঁদের প্রজা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রক্ষক হবেন না ভক্ষক হবেন তারই উপর নির্ভর করছে গণতন্ত্রের স্থিতি বা ইতি।

মূল কথা: মৌল অধিকার

লোকসভার নির্বাচনের একদিন আগেও আমি আকাশের দিকে কান পেতে বসেছিলুম। কখন এক সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করবেন যে, "এমারজেন্সি রহিত হলো। নির্বাচনের পরে সংশোধিত সংবিধানেরও রদবদল নিশ্চিত।"

কিন্তু ইন্দিরাজী আমার মতো আশাবাদীকে নিরাশ করলেন। ফলে নিজেও নিরাশ হলেন। যে প্রধানমন্ত্রী ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন বলে চিরকাল প্রসিদ্ধ তাঁর যে এমন মতিভ্রম হবে কেই বা কল্পনা করতে পেরেছিল? কিন্তু বিপথে পা বাড়ালে এইরকমই হয়। মন্ত্রীমণ্ডলকে না জানিয়ে তাঁদের পরামর্শ না শুনে তিনি হঠাৎ একদিন তাঁর স্বকীয় সিদ্ধান্তেই এমারজেন্সী জারী করেছিলেন। তৎকালীন রাষ্ট্রপতির বকলমে।

নির্বাচনে হেরে গিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এমারজেন্সী তুলে দিলেন, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তিনি সংশোধিত সংবিধানের রদবদল করতে পারতেন না। তার জন্যে দরকার হতো লোকসভায় তথা রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট। উপরন্তু রাজ্য বিধানসভাগুলির অর্ধেকের সম্মতি। নির্বাচনে জিতে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীমোরারজী দেশাই, নতুন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু লোকসভায় তাঁর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট থাকলেও রাজ্যসভায় ছিল না। রাজ্য বিধানসভাগুলির প্রায় সব কটাতেই কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সংশোধিত সংবিধানের গোটা কয়েক ধারা রদ করতে গিয়ে নতুন সরকার রাজ্যসভায় বাধা পান। বাধা না পেলে যা হতো তা এই যে, যে-সব বিধানসভার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হয়েছিল সে-সব বিধানসভা আপনি ভেঙে যেত। তাদের মধ্যে পড়ত দক্ষিণের চারটি রাজ্যের বিধানসভা,

কিন্তু ওড়িশা তথা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নয়। তাদের মেয়াদ পূর্ণ হতে আরো দু বছর বাকী। রাজ্যসভা নারাজ হওয়ায় নতুন সরকারকে সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরতে হলো। তাঁরা দক্ষিণের চারটি রাজ্যের গায়ে হস্তক্ষেপ করলেন না, কারণ সেখানে লোকসভার নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, লোকে কংগ্রেসকেই চায়। তাঁরা ওড়িশা তথা উত্তরপ্রদেশ সমেত উত্তর ভারতের নয়টি বিধানসভা ভেঙে দিলেন। কারণ লোকসভার নির্বাচনে প্রমাণ হয়ে গেছে লোকে কংগ্রেসকে চায় না।

এই যুক্তি সংবিধানসম্মত কি না এ বিষয়ে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের পক্ষে চোখ বুজে স্বাক্ষর দেওয়া সহজ-সাধ্য ছিল না। তাঁকে সমঝিয়ে দেওয়া হলো যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সংশোধিত সংবিধান অনুসারে তাঁর শুধু স্বাক্ষর দানেই অধিকার। আর সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ইন্দিরাজী থাকলে কি তিনি এক মুহূর্ত ইতস্তত করতে সাহস পেতেন? মোরারজী এসেছেন বলেই কি বিশ ঘণ্টা গড়িমসি? ভদ্রলোককে মানে মানে স্বাক্ষর দিতেই হলো। তা না হলে সে যা সঙ্কট হতো তা অভাবনীয়। তাঁকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা নেই কারো, ইমপীচ করাও সহজ নয়, রাজ্যসভা বাধা দিত, সময়ও লাগত অনেক। তা হলে কি প্রধানমন্ত্রীই পদত্যাগ করতেন? আবার নির্বাচন পর্ব? ইতিমধ্যে সরকার গঠন করতেন কে? সংবিধানে তার ব্যবস্থা নেই। আমাদের সংবিধান একটি মহাভারত বিশেষ, অথচ এ হেন সঙ্কটের বেলা নিরুপায়।

সময়েই হোক আর অসময়েই হোক বিধানসভার নির্বাচন লোকে মেনে নিয়েছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ভোট। ভোটে স্থির হবে কোন্ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কোন্ দল সরকার গঠন করবে। কিন্তু এই কি সব? আরো একটা কথা আছে যে! নির্বাচিত সদস্যরা আরো একদফা প্রতিনিধি নির্বাচন করে রাজ্যসভায় পাঠাবেন। সেখানে যাঁরা যাবেন তাঁরা লোকসভার সদস্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সংশোধিত সংবিধান রদবদলের চেষ্টা করবেন। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও তাঁদের সকলের ভোটের উপর নির্ভর করছে। বিধানসভার নির্বাচন তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একটি তো নয়টি রাজ্যে নতুন সরকার গঠন। আর একটি সংশোধিত সংবিধানের রদবদলের প্রয়াস। তৃতীয়টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ।

রাষ্ট্রপতি পদে যিনিই নির্বাচিত হোন তাঁকে মন্ত্রীমণ্ডলের ইচ্ছায় চালিত

হতে হবে। সুতরাং সেদিক থেকে এ নির্বাচন এমন কী গুরুত্বপূর্ণ? এর উত্তর, কংগ্রেস যদি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকেই ভোটের জোরে রাষ্ট্রপতি পদে সমাসীন করে তবে তিনি তাঁর অঘটন ঘটন-পটীয়সী বুদ্ধির জোরে কী যে করে বসবেন তা কেউ বলতে পারে না। কই, তিনি তো মুখ ফুটে বলছেন না যে তিনি রাষ্ট্রপতি পদের জন্যে প্রার্থী হবেন না। সকলের মতো তাঁরও রাষ্ট্রপতি হবার অধিকার আছে, কিন্তু তার পরে যদি সঙ্কট ঘনিয়ে আসে তা হলে কী হবে তার উত্তর সংবিধানে নেই।

সংবিধানের উপরেই আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চাই। সংবিধান থাকলেই মাঝে মাঝে তার সংশোধনের প্রয়োজন হয়। অতীতেও হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে। নীতির দিক থেকে সংবিধানের দ্বিচত্বারিংশত্তম সংশোধন আপত্তিকর নয়। আপত্তি এইখানে যে পার্লামেণ্ট উক্ত সংবিধান সংশোধনের পূর্বেই তার পাঁচ বছরের কার্যকাল অতিক্রম করেছে, সুতরাং ম্যাণ্ডেট হারিয়েছে। এমারজেন্সীর সুযোগ নিয়ে, সেন্সরশিপের সুবিধে নিয়ে সে রাতারাতি সংবিধানের খোল নলচে বদলে দিয়েছে।

আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। আমাদের কাছে আমাদের মৌল অধিকার থাকা না থাকা জীবন মরণের প্রশ্ন। একহাতে মৌল অধিকার কেড়ে নিয়ে আরেক হাতে যদি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিলিয়ে দেওয়া হয় তবে সমাজতন্ত্র হলেও হতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র হবে না। আর গণতন্ত্র যদি না হয় তবে এক পার্টির শাসন হলেও হতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্বিবাদে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে না। যে কর্তা হবে সে একটানা সাত বছর বা সতেরো বছর বা সাতাশ বছর কর্তৃত্ব করলেও কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। এসব নিবারণ করার জন্যেই সংবিধান। আর সংবিধানের মূল ভিত্তিই হচ্ছে মৌল অধিকার। সেইজন্যে আমাদের মূল প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি আমাদের মৌল অধিকার ফিরে পাব? নির্বাচনপ্রার্থীরা কি আমাদের কথা দিতে রাজী আছেন যে নির্বাচনের পর তাঁরা আমাদের মৌল অধিকার ফিরে পেতে সাহায্য করবেন?

আত্মানং সততং রক্ষেৎ

আমার আজকালকার সর্বপ্রধান চিন্তা হলো, আমি কেমন করে আত্মরক্ষা করব। কেবল কায়িক অর্থে আত্মরক্ষা নয়, মানসিক অর্থে আত্মরক্ষা, বাচিক অর্থে আত্মরক্ষা। আমি একজন সারস্বত। একজন কবি, কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকার। একজন স্রষ্টা, দ্রষ্টা, পথনির্দেশক। দেশের ইনটেলেকচুয়াল লীডারশিপ আমার মতো কয়েকজনের উপরেও বর্তেছে। প্রাণের ভয়ে বা দুর্ভোগের ভয়ে আমরা কখনো আমাদের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনে। প্রলোভনে পড়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারিনে। সামনে আমাদের ক্ষুরধার পন্থা। লিখলেও বিপদ, না লিখলেও বন্ধ্যাত্ব। স্টেরিলাইজেশন।

বিশেষ করে আমার সামনে এখন একরাশ অসমাপ্ত কাজ। যা আমি ছাড়া আর কারো হাত দিয়ে সম্পন্ন হবার নয়। ত্রিশ বছর ধরে যে উপন্যাসটির জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছি তার সমাপ্তির জন্যে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। শরবৎ তন্ময় না হলে সে কাজটা ব্যহত হবে। সেইজন্যে আমি দশ জনের দশ রকম ফরমাস খাটতে নারাজ। তবু খাটতেই হয়, কারণ আমি একজন সামাজিক মানুষ। নির্মমভাবে 'না' বলতে কুণ্ঠা বোধ করি। এমনিতেই আমি যথেষ্ট অসামাজিক। সামাজিকতা করতে সময় পাইনে। কিন্তু এখনো সমাজে বাস করছি। শ্রীঅরবিন্দ বা পাবলো পিকাসো ব'নে যাইনি। তা ছাড়া একজন ঔপন্যাসিক যদি পাঁচজনের সঙ্গে না মেশে, যদি সব সময় দরজা বন্ধ করে লেখে, তাহলে তার জীবনের অভিজ্ঞতা বাড়ে না। আর তার জীবনের অভিজ্ঞতাই তো তার পুঁজি।

তারপর এখনো আমার কবিতার কাজ বাকী। কতক কথা আছে, তা

কবিতা আকারেই ব্যক্ত করতে হয়। আমি আবার এমন একজন কবি যে কবিতা বলতে বোঝে ছন্দোবদ্ধ মিত্রাক্ষর কবিতা। ফ্রী ভার্স আমি জীবনে একবারমাত্র লিখেছি। সেটা আমার এপিটাফ। নিজের উপর অমন একটা অনুশাসন না চাপালে আমার কবিতার সংখ্যাও আমার প্রবন্ধসংখ্যার সমান হতো। কিন্তু তা হলে আবার এমন অভিযোগও উঠত যে ওগুলিও বর্ণচোরা প্রবন্ধ। পদ্যের মতো করে সাজালে কী হবে, কবিতা বলে কথিত বস্তুটি কবির বক্তব্যমাত্র।

ছেলেবেলায় আমার হাতে এক তাড়া 'সবুজপত্র' পড়ে। তখন থেকেই 'আর্ট' বলে একটি শব্দ আমার মনে গেঁথে রয়েছে। কী যে ওর অর্থ তখন আমি তা বুঝতুম না। পরে নানা মুনির নানা ব্যাখ্যা শুনেছি। নানা মুনির অনুকরণ বা অনুসরণও করেছি। শেষে নিজেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তার আগে রকমারি এক্সপেরিমেণ্ট করেছি। 'আর্ট' নামক ওই শব্দটি আমার জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে যে আমার নিজের বিশ্বাস আমি একজন আর্টিস্ট ও আর্টিস্ট ছাড়া আর কিছু নই। আমি যাই লিখি না কেন, প্রবন্ধ বা ছড়া বা গল্প, তা যদি আর্ট না হয় তবে তা আমার চোখে ব্যর্থ। যে পরিমাণে তা আর্টোত্তীর্ণ সেই পরিমাণে তা কালোত্তীর্ণ। যা আজ বাদে কাল বাসি হয়ে যাবে তা লিখে আমার কতটুকু তৃপ্তি: বিষয়টা যদিও খুব জরুরী তবু শুধু বিষয়গুণেই লেখা কখনো সাহিত্যের মর্যাদা পায় না। তাই যদি হতো আমাদের সাংবাদিকদের মতো ভাগ্যবান কে? যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।

'সবুজপত্র' আমার সাহিত্যিক জীবনের সুর বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু আমি সেইখানে থেমে থাকিনি। বারো বছর বয়স থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কতরকম বিষয়েই না মাথা ঘামিয়েছি! আর্টের চৌহদ্দির ভিতরে নিয়ে এসেছি কতরকম না বিষয়। বাল্যকাল থেকেই আমি শুনে এসেছি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে একটা সীন্থেসিস ঘটানো দরকার। সে ভার নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। আমিও সে ভার নিজের কাঁধে তুলে নিই। আমি হই তাঁদের উত্তরসাধক। সে সাধনা এখনো অসমাপ্ত। প্রাচ্য প্রতীচ্যের সীন্থেসিস এখনো সুদূর। লোকের ধারণা ইংরেজরা দামী জিনিস কিছুই দিয়ে যায়নি, সব কিছুই নিয়ে গেছে। কী কী নিয়ে গেছে ও কী কী দিয়ে গেছে এর একটা সামগ্রিক হিসাবনিকাশ প্রয়োজন। করতে হবে আমার

মতো যারা দুই দেশের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত, দুই সভ্যতার কোলে লালিত। এটাকে আমি একটা কর্তব্য বলে স্বীকার করেছি। প্রাচ্য আর দুই প্রতীচ্য মিলেই বিশ্ব। যে মানুষ বিশ্বপ্রেমিক হবে সে একই কালে ভারতপ্রেমিক তথা ইউরোপপ্রেমিকও হবে। ইউরোপকে ঘৃণা করে বা খাটো করে বিশ্বপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক হওয়া যায় না। ভারতপথিক রামমোহন ইউরোপপথিকও ছিলেন। ছিলেন বিশ্বপথিক। তাঁর সেই পন্থা আমারও পন্থা।

রামমোহনের মতো আমারও অপর একটি কর্তব্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মেলবন্ধন। যেখানে আমার জন্ম সেখানে আমাদের পেছনদিকের প্রতিবেশী একঘর পশ্চিমা মুসলমান। ব্যক্তিগত জীবনে ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরকাল মধুর। হিন্দু পুরুষ যে মুসলমান নারীকে হরণ করে এটা অবিশ্বাস্য হলেও এ রকম ঘটনা আমার বাল্যকালে বার দুই ঘটে। প্রথমবারের নারীটি আমার মাষ্টারনী। আমাকে আদর করে খাওয়াতেন মুরগীর ডিম, যেটা আমাদের বাড়ীতে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়বারের পুরুষটি আমাদেরি এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সুদর্শন সাহেবী পোষাকপরা ডাক্তার। দেশীয় রাজ্যে আমার পিতার বাস। হিন্দুর উপর হিন্দুর অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী আমি। খারাপ কেবল মুসলমানরাই, অত্যাচারী কেবল মুসলমানরাই, এসব কথা আমাদের বাড়ীতে কখনো শুনিনি। শুনেছি বাইরে, শুনেছি কেবল তাদেরি মুখে যারা কখনো মুসলমানদের সঙ্গে মেশেনি বা হিন্দুদের অন্যায়গুলো দেখেনি। হিন্দু আর মুসলমান দুই মিলেই ভারতবর্ষ। ভারতপ্রেমিক যারা হবে তারা একইকালে হিন্দুপ্রেমিক তথা মুসলমানপ্রেমিকও হবে। মুসলমানকে ঘৃণা করে বা খাটো করে ভারতপ্রেমিক বা বঙ্গপ্রেমিক হওয়া যায় না।

এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে আমার জীবনের আদিপর্বই যথেষ্ট। কিন্তু অন্তিম পর্বে উপনীত হয়েও আমি অপর দশজনকে উপলব্ধি করাতে পারিনি। গান্ধীজী তো প্রাণটাই হারালেন। আমি অবশ্য ততদূর যাইনি, তবে আমিও কিছুদূর গেছি। মানচিত্রের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। ওটা তো রামমোহনের, রবীন্দ্রনাথের ও গান্ধীজীর ব্যর্থতার মানচিত্র। সেই সঙ্গে আমারও।

তৃতীয় যে কর্তব্য নিয়ে আমি গান্ধীজীর প্রভাবে আসার পর থেকে চিন্তান্বিত সেটা হচ্ছে জনগণের সঙ্গে সাযুজ্য। একই সময়ে আমি টলস্টয়ের

প্রভাবেও আসি। জনগণের জন্যে লিখিত তাঁর তেইশটি গল্পের সংগ্রহ আমি স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। তার একটা বাংলায় তর্জমা করে সেই বয়সেই 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। টলস্টয় আর রবীন্দ্রনাথ মিলে তৈরি করে দিয়েছেন আমার সাহিত্যদর্শন। গান্ধী আর রবীন্দ্রনাথ মিলে স্থির করে দিয়েছেন আমার জীবনদর্শন। এঁদের সঙ্গে আমি মনেমনে বাদানুবাদ করেছি। বিনা বাক্যে একটি কথাও মেনে নিইনি। শেষপর্যন্ত আমি এঁদের সন্নিধানে এসে পৌঁছেছি। তিনজনেই নগরবিমুখ। তিনজনেই পল্লীপ্রাণ। তিনজনেই চেয়েছেন জনগণের মুক্তি ও তাদের সঙ্গে একাত্মতা। এঁদের আরব্ধ কর্ম এঁরা সমাপ্ত করে যেতে পারেননি, পারলে রাশিয়াতে বিপ্লব ও ভারতে নক্‌শাল বিক্ষোভ ঘটত না। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ এখন লোহার জাল দিয়ে ঘেরা 'রক্তকরবী'র রাজনিকেতন। নইলে নক্‌শালরা রবীন্দ্রনাথের কীর্তি ধ্বংস করত। ক্রমশ দেশটাও 'রক্তকরবী'র রাজনিকেতন না হয়ে ওঠে! আমার কাছে অহিংসা কেবল একটা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন নয়। এটা মানুষের প্রাণরক্ষার তথা কীর্তিরক্ষারও প্রশ্ন। শুধু ভারতেই নয়, সারা জগতে।

সেনসরশিপ প্রসঙ্গে ভাষণ

[এমারজেন্সী ঘোষণার কয়েক মাস পরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পশ্চিমবঙ্গ প্রবন্ধ লেখক সম্মেলনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আমিও আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিই। আলোচনাকালে আমি যা বলি তা লিখিত ভাষণ নয়। সেখানে উপস্থিত কেউ সেটি রেকর্ড করেন নি। কেউ যদি লিখে নিয়ে থাকেন আমাকে তা দেখান নি। অনেকদিন পরে পুলিশ থেকে আমাকে একটি অননুমোদিত পত্রিকার ফোটোস্টাট কপি দেখানো হয়। আমারি ভাষণ, অথচ ভুলভ্রান্তিতে কণ্টকিত। আমি ওটি সংশোধন করে পুলিশের হাতে ফেরৎ দিই। তারপরে আর তাঁদের দেখা পাইনে। ওটি নিয়ে তাঁরা কী করলেন জানিনে। এমারজেন্সী উঠে যাওয়ার পরে শারদীয় 'যুগবাণী'তে আবার সেই ভাষণেরই অসংশোধিত রূপ দেখি। এঁরা আমার ভাষণটিকে স্থায়ী আকার দিয়েছেন, এর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আবার সেইসব ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করে বিব্রত। "যুগবাণী"তে প্রকাশিত প্রতিলিপিটিকে সংশোধন করলে এইরকম দাঁড়ায়—]

সেনসরশিপের নামে সাহিত্যের উপরও আজ হস্তক্ষেপ শুরু হয়েছে। যাঁরা সেনসর করেছেন তাঁদের নিজেদের বুদ্ধির দৌড় কতটা তার পরিমাপ না হলেও তাঁরা সাহিত্যিকদের শিশু বলে মনে করছেন। এবং যথেচ্ছভাবে তাঁদের লেখার উপর কলম চালাচ্ছেন। সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন দায়িত্বশীল লেখকদের শিশু বলে মনে করা ঠিক নয়।

আমি অন্নদাশঙ্কর রায়, আমার মতো যে সাহিত্যিক গত পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্য সাধনা করছে তার সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার অর্জন করতে যে সাহিত্যরসবোধ থাকা দরকার তা কি এঁদের আছে ?

ব্রিটিশ শাসনকালে আমি একজন পদস্থ আই সি এস অফিসার ছিলুম। সেই ভিনদেশী শাসনকালেও স্বাধীন সাহিত্যচিন্তার যে অবাধ গতি ছিল সেটাও আজ বিঘ্নিত হতে বসেছে।

সাধারণত চিরায়ত সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি সাময়িকতাও সাহিত্যে আছে, থাকবেও। সাহিত্যিকরা প্রত্যেকদিন মুখ খোলেন না। তবু সাহিত্যে সাময়িকতা এসে পড়ে। কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়ের মতো সাহিত্য কোনো রুটিন ওয়ার্ক নয়। সেইজন্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কোনো সময়েই 'সভ্যতার সংকট'-এর পর্যায়ে পড়বে না। যদিও রবীন্দ্রনাথের ঐ লেখাটি সাময়িকীর পর্যায়েই পড়ে।

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী কিছু 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' সাংবাদিকের লেখা নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে সরকার প্রি-সেনসরশিপ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। এখন যাঁদের দিয়ে সেনসর করানো হচ্ছে সেইসব সরকারী অফিসার, যাঁদের বয়স ও অভিজ্ঞতা কম—বিবেকবান লেখকদের বক্তব্য কী সেটা জানার কোনো প্রয়োজন বোধ করলেন না, এমন কি সাহিত্য কী তা বোঝার ক্ষমতা অর্জন করলেন না, অথচ ইচ্ছেমতো ঘ্যাঁচ করে কেটে দিলেন। এর কী জবাবদিহি তাঁরা ভবিষ্যতের কাছে দেবেন?

সাহিত্যিকরা মত প্রকাশ করবেন না, তা কি হয়? চন্দ্রগ্রহণের মতো সাহিত্যিকদের রাহুগ্রস্ত হয়ে থাকতে হবে, তা হয় না।

'অমৃত' শারদীয় সংখ্যার জন্যে একটি হাসির গল্প লিখেছিলুম। তার একাংশে ছিল, "কোবরেজী ওষুধে কি অমনি ফল হয়, যদি না সঙ্গে থাকে অনুপান? তেমনি, কর্মদক্ষতায় কি অমনি ফল হয়, যদি সঙ্গে না থাকে সুরাপান? পান করতেও হয়, করাতেও হয়। সেকালে তো এইটেই ছিল ফলপ্রদ পদ্ধতি। একালে কি পালাবদল হয়েছে?...হুঁ হুঁ! তুমি জানো সবই, কিন্তু বলবে না! একালে ওষুধের মাত্রা কমেছে। অনুপানের মাত্রা বেড়েছে। ইংরেজ নেই, এখন সব জায়গায় স্কচ।"

এই অংশের শেষের উক্তি ক'টি সেনসর তাঁর খুশিমতো বর্জন করেন। ফলে আমার গল্পের যেখানে রগড় বা হুল সেই জায়গাটি বাদ গেল। গল্পটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ইংরেজ নেই, কিন্তু স্কচ এখন সর্বঘটে। এতে যদি সেনসরের আপত্তি থাকে তা হলে বুঝতে হবে কর্মদক্ষতার চেয়ে সুরাপানের মাত্রা বেড়ে গেছে এই ইঙ্গিতটা অমূলক নয়। কিন্তু এর মধ্যে রাজনীতি কোথায়?

কেন এটা সেনসরশিপের আমলে আসবে? তা হলে কি সুরাপানের নিন্দা করাও নিষিদ্ধ? সুরাপানই কি রাজকীয় নীতি?

কিংবা এমনও হতে পারে যে স্কচ মানে তিনি বুঝেছেন স্কটল্যাণ্ডের লোক। ইংরেজ চলে গেছে, স্কটল্যাণ্ডের লোক এখন সব জায়গায়, একথা বললে অবশ্য জাতীয় মর্যাদায় বাধে। রাজনীতি এসে পড়ে। এখানে স্কচ বলতে সুরাপান বুঝিয়েছে না স্কটল্যাণ্ডের লোক বুঝিয়েছে সেটা আগে বিচার করে ছাখো, বিচারের ক্ষমতা অর্জন করো, তবে না কাটাকুটি। তা ছাড়া যারা লেখক নন তাঁদের এই presumption থাকা উচিত নয় যে, তাঁরা বিবেকবান লেখকদের ডিউটি-বোধ শেখাবেন। এই ধরণের কাজ চলতে থাকলে সাহিত্যের অবনতিই ঘটবে।

আশঙ্কা হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে লেখকদের উপর হয়তো ফরমাস জারী করাও শুরু হবে। লেখকেরা এই অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারেন না। তাঁরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেনই। কথা হচ্ছে, এই প্রতিবাদের রূপ কী হবে? আমি অন্নদাশঙ্কর রায়—আমি তো রাস্তায় গিয়ে ঢিল মারতে পারি না। তা হলে প্রতিবাদ জানাব কী করে? অভিমান করে লেখাই বন্ধ করে দেব। এমারজেনসী যতদিন থাকবে, লেখকদের লেখার উপর এই ধরণের হস্তক্ষেপ যতদিন থাকবে, ততদিন অন্নদাশঙ্কর রায় আর কিছুই লিখবে না। এটাই তার প্রতিবাদ।

আপনারা যারা সরকারী অফিসার এখানে রয়েছেন তাঁদের যা ব্যাপার-স্যাপার দেখছি তাতে এখন থেকে শুধু শিশুপাঠ্য লেখাই লিখতে হবে। তা তো আর আমি পারব না। তাই যতদিন এমারজেন্সী থাকবে ততদিন আমি এই পথেই প্রতিবাদ জানিয়ে যাব। এটা আমার নীরব প্রতিবাদ।

[এই বক্তৃতা যখন দিই তখন আমার ধারণা ছিল যে এমারজেন্সীর আদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, দেশে আইন ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, মাস দু'তিনের মধ্যে এমারজেন্সী তুলে নেওয়া হবে। সুতরাং সেই মাস দু'তিন আমাকে নীরব থাকতে হবে। কিন্তু আরো একবছরের উপর ওটাকে নানা অজুহাতে প্রলম্বিত করা হলো। ইতিমধ্যেই আমি মাস চার পাঁচ নীরব থেকেছি। আরো তিন চার মাস নীরব থাকার পর আবার আমি বিভিন্ন পত্রিকার অনুরোধে লেখা পাঠাতে শুরু করি। প্রধানত শিশুপাঠ্য। পরে

শারদীয় সংখ্যার জন্যে গল্প, প্রবন্ধ। যেসব পাঠকপাঠিকার সঙ্গে আমার বহুকালের সম্বন্ধ তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ কোনো কারণেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে সেনসরশিপ এড়িয়ে চলাও লেখকের পক্ষে অস্বস্তিকর। সেই যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যাওয়া একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তা বলে আমি আত্মসমর্পণ করিনি। সে সময়ের লেখাগুলো যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখেছেন আমি স্বাধীনভাবেই লিখেছি।]

এবারকার স্বাধীনতা দিবস

এবারকার স্বাধীনতা দিবস অন্যান্যবারের মতো নয়। ত্রিশ বছর পরে এর অন্য চেহারা। এক পুরুষ ধরে ভারত সরকার চালিয়ে আসছিল একটিমাত্র রাজনৈতিক দল। তার নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। ইণ্ডিয়ান নেশন বলতে গেলে এরই হাতে গড়া। যারা ইণ্ডিয়ান নেশনকে ভালবাসে তারা একেও ভালবাসে। কিন্তু সেই সুবাদে কি ত্রিশ বছর ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করতে দেওয়া যায়? চল্লিশ বছর ধরে? পঞ্চাশ বছর ধরে? না, ভালবাসারও একটা সীমা আছে। কোথাও যদি দেখি যে একই দল পঞ্চাশ বছর ধরে শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছে তা হলে ধরে নিতে হবে যে সে দেশে দ্বিতীয় কোন দল নেই। তার মানে দ্বিতীয় কোন মত নেই। মতের সঙ্গে মতের পার্থক্য নেই, বিরোধ নেই। কিন্তু মানবপ্রকৃতি পার্থক্য আর বিরোধ দিয়ে ভরা। সুতরাং কোথাও যদি দেখি একটিমাত্র দলই আছে, দ্বিতীয় কোন দল নেই, তার অর্থ দ্বিতীয় কোন দলকে মাথা তুলতে দেওয়া হয়নি, জোর করে উৎখাত করা হয়েছে। বাহুবলই সেখানে নিয়ামক। মানবিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়। ভোট সেখানে কর্তার ইচ্ছায়। ভোটদাতার ইচ্ছায় নয়। কর্তার ইচ্ছাকে ভোটদাতার ইচ্ছায় পরিণত করার কলাকৌশল সে দেশের কর্তৃপক্ষের নখদর্পণে। সুতরাং সে দেশে যেটা চলে সেটা একপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

আমাদের এ দেশের সংবিধান যাঁরা রচনা করেছিলেন তাঁরা কর্তার ইচ্ছাকে নয়, লোকের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। লোকে যদি ইচ্ছা করে এক দলের শাসনকে চিরস্থায়ী করতে পারে। অথবা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এক এক দলের হাতে শাসনের ভার দিতে পারে। অথবা একাধিক দলকে

একজোট করে তাদের হাতে শাসনভার সঁপে দিতে পারে। তবে আমাদের সংবিধানে দলশূন্য গণতন্ত্রের কোনরূপ পরিকল্পনা নেই। পার্টিলেস ডেমোক্রাসী কথাটা আর কোন দেশের সংবিধানেও দেখা যায় না। দলশূন্য যদি চাও তো বুরোক্রাটদের সর্বেসর্বা করো। নতুবা মিলিটারিকে। তার মানে গণতন্ত্রকেই বাদ দাও। এ পরীক্ষা তো পাশের বাড়িতেই চলছে। আমরা কি ওদের কাছে শিখব? না ওরা আমাদের কাছে?

আমাদের দেশের প্যাটার্নটা দলশূন্যও নয়, একদলীয়ও নয়। এ দেশে কংগ্রেসই একমাত্র দল নয়। আরও দল আছে। লোকে তাদেরও ভোট দিয়ে পার্লামেণ্ট পাঠিয়েছে। তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেনি, জোট বেঁধে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়নি, সুতরাং শাসনকার্যের ভার পায়নি। তার জন্যে কংগ্রেস দায়ী নয়। কংগ্রেস বরাবরই নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ নির্বাচনের সুযোগ দিয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল দু'বার। আগের বার পাঁচ বছর পূর্ণ হবার আগেই পার্লামেণ্ট ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করা হয়। নয়তো কংগ্রেস হেরে যেতে পারত। এবার পাঁচ বছর পূর্ণ হবার পরেও পার্লামেণ্টকে আরও এক বছর জীইয়ে রাখা হয়। যাতে কংগ্রেস হেরে না যায়। জুয়া খেলাটা আগের বার সফল হয়েছিল। এবার বিফল হয়। জুয়াড়িরা কি ফী বার জেতে? রাজনীতিকে যারা জুয়াখেলার পর্যায়ে নামিয়ে আনে তাদের গণনা জনগণের ইচ্ছার সঙ্গে সব সময় মেলে না। তারা জনগণের নাড়িতে হাত না রেখে নিজেদের মোসাহেব ও গুপ্তচরদের উপরেই বিশ্বাস রাখে। রাজা ক্যানিউটের সভাসদ্‌রা তাঁকে বুঝিয়েছিল যে, তিনি যদি আজ্ঞা করেন সমুদ্র হটে যাবে। সমুদ্র হটে গেল না, তিনিই ভেসে গেলেন। অনুরূপ ঘটনা ঘটে গেল আমাদেরও চক্ষের সুমুখে।

এবারকার স্বাধীনতাদিবসে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস নেই। হ্যামলেটের অভিনয়ে ডেনমার্কের যুবরাজ নেই। আমরা যারা আশৈশব কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছি তাদের অন্তরে কংগ্রেসের প্রতি একটা অহেতুক মমতা। তার সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও সে কংগ্রেস। তার মতো ঐতিহ্য আর কোন দলের নয়। কিন্তু এটাও আমাদের জানতে বাকি নেই যে এই ত্রিশ বছরে খোল আর নলচে দুই বদলে গেছে। ত্যাগীরা অদৃশ্য। ভোগীরা ভেকধারী ভণ্ড সাধু। অহিংসা তো গান্ধীজী থাকতেই প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছিল। সত্যও ক্রমে ক্রমে শূন্যে এসে ঠেকেছে। কংগ্রেসের আর সে ক্রেডিবিলিটি নেই।

আমাকে কতজন যে বলেছেন, 'আমি ওদের একটি কথাও বিশ্বাস করি নে। ওরা সব পারে। খুন করা, গায়েব করা, টরচার করা, কিছুই ওদের অসাধ্য নয়!' দেশের লোককে এমন ব্যাপকভাবে সন্ত্রস্ত হতে এর আগে কখনও আমি দেখিনি। কংগ্রেসের একজন প্রাচীন কর্মী আমাকে বলেন, "কংগ্রেসের দুই উপদলের মধ্যে সম্পর্ক এখন এমন বিষাক্ত যে ওরা আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও পারে।"

কংগ্রেস যদি অহিংসাকে শত্রুর বেলা পরিত্যাগ করতে চায় করুক। কিন্তু মিত্রের বেলা, সহকর্মীর বেলা, সমর্থকদের বেলাও কি পরিত্যাগ করবে? এ হল পয়লা নম্বর প্রশ্ন। দোসরা নম্বর প্রশ্ন হল, সত্যকেও কি লোকের চোখে ও কানে পড়তে দেবে না? কলকাতায় মিটিং করার জন্যে শ্রীশৈবালকুমার গুপ্তকে ও আমাকে পুলিস কমিশনারের অনুমতি নিতে হয়েছিল, তাও ঘেরা জায়গায় ও কার্ড পাঠিয়ে। ওটা ছিল সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত মিটিং। রাজনীতি বর্জিত। খবরের কাগজে তো আমরা পাত্তা পাইনি। সেনসর হয় কাটছাঁট করেছেন, নয় বাতিল করেছেন। আমাদের যেটা লেজিটিমেট রাইট সেটা ইংরেজ সরকারও এভাবে পদদলিত করেননি। সম্পাদকরাও ভয়ে কাবু। সেনসরকে না দেখিয়েই লেখা ফেরত দেন। যে লেখা আমাদের পক্ষে জীবন মরণের প্রশ্ন। যার জন্যে গৌরকিশোরকে জেলে যেতে হল। আর জ্যোতির্ময় দত্তকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গিয়ে লড়তে হল। এ লড়াই ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়। সাধারণের স্বার্থে। মানব-ইতিহাসে এ রকম লড়াই আরও অনেকবার হয়েছে। তার ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমেই বেড়ে গেছে। এই স্বাধীনতা আমাদের মানবিক উত্তরাধিকার। একে খর্ব হতে দিলে আমরাই মানুষ হিসাবে খর্ব হবো। দেশটা হবে বামনের দেশ। বামনরা হয়ত ভাল খাবে, ভাল পরবে, তাদের হয়ত পরমাণু বোমাও থাকবে, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দামী জিনিস থাকবে না। সেটা সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা।

রাইট অব ডিসেণ্ট না থাকলে গণতন্ত্র থাকে না। তবে এমন দাবি আমি করব না যে কথায় কথায় নির্বাচিত বা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে গালাগাল দেওয়া বা লোকচক্ষে হেয় করাটাও রাইট অব ডিসেণ্ট। বেসরকারী বাড়াবাড়িও আমি অনেক দেখেছি। তা বলে সরকারী বাড়াবাড়িও তো মার্জনা করা যায় না। যাদের হাতে শুধু কলম আছে তাদের বাড়াবাড়ি আর যাদের হাতে উপরন্তু বেয়োনেট আছে, ব্যাটন আছে, কয়েদখানা আছে, বেতার

আছে তাদের বাড়াবাড়ি কি একই পর্যায়ের? একজন লেখক যদি দুটো কটু কথা বলে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরো দুটো কটু কথা বলবার মতো লেখক কি সরকারী শিবিরে ছিলেন না? গৌরকিশোরকে, জ্যোতির্ময়কে কি তাঁরা মুখের মতো জবাব দিতে পারতেন না? ক'জন পড়ে 'কলকাতা' নামক লিটল ম্যাগাজিন! সরকারের নিজস্ব দৈনিক পত্রিকা পড়ে আরো বেশী লোক। যেখানে মসীযুদ্ধে সরকারই জয়ী হতেন সেখানে জনা দুই সাংবাদিককে বিনা বিচারে জেলের ভাত খাওয়ানো কেন? আর জ্যোতির্ময়ের ঠেলা তো আমাকেও সামলাতে হয়েছে। আমার কন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে পুলিস ঘরে ঢুকেছে। যেহেতু জ্যোতির স্ত্রী মীনাক্ষী তার স্কুলের সহকর্মী।

পুলিস এসেছিল আরো একবার আমার নিজের বক্তৃতার অনুলিপি আমাকে দেখাতে। ছেপেছে একটি বে-আইনী পত্রিকা। ওটা শ্রুতিলিপি নয়, জনশ্রুতিলিপি। ওতে বিস্তর ভুলভ্রান্তি। আমি সংশোধন করে দিই। তার উপরেও আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারা যেত। নিলে আমি অসহায়। আদালতের দুয়ার বন্ধ।

স্বয়ং অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রীনীরেন দে বলছেন তিনিও ছিলেন সন্ত্রস্ত। আরো আগে বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম। সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পর্যন্ত নানা স্তরের নাগরিকদের মুখে একই লাঞ্ছনার ইতিহাস। এর পরিণাম যে কংগ্রেসের পক্ষে বিপর্যয়কর হবে এটা তো এখন মনে হচ্ছে স্বতঃসিদ্ধ। তখন অবশ্য আমরা এতদূর এগিয়ে ভাবতে পারিনি। হাজার হোক কংগ্রেস আমাদের আপনার জিনিস। তার পতন কি আমরা কল্পনা করতে পারি? কিন্তু তাসের কেল্লার মত সে ভেঙে পড়ল। লোকে যে তার বিরোধীপক্ষের প্রেমে পড়ে তাকে ত্যাগ করল তা নয়। তার উপর বিশ্বাস হারানোই তালাকের কারণ। কী করে সে আবার বিশ্বাস ফিরে পাবে সেটাই হোক তার প্রাথমিক ভাবনা।

ভালই হল যে, দেশে দুই পার্টি সিস্টেম প্রবর্তিত হল। এখন থেকে আর একই দল প্রতিবার ব্যাট ধরবে না, অন্যান্যরা বোল করবে না, ফিল্ড করবে না। পালা করে দুই দলই ব্যাট ধরবে, বোল করবে, ফিল্ড করবে। সরকার পক্ষের নেতারা হবেন বিরোধী পক্ষের নেতা। বিরোধী পক্ষের নেতারা হবেন সরকার পক্ষের নেতা। আমরা যারা সাধারণ ভোটার তাদের মর্যাদা

বেড়ে যাবে। আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে, আমাদের লেখা সেনসর করতে, আমাদের বিনা বিচারে জেলে আটক রাখতে, আমাদের বাড়িতে হানা দিতে কোন পক্ষ সাহস পাবেন না। সেসব যদি ঘটে তো যুদ্ধকালে ঘটবে। শান্তিকালে সুস্থ মানুষকে ব্যস্ত করা চলবে না।

এবারকার স্বাধীনতা দিবস আমাদের অনেকের পক্ষে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার দিবস। নিঃশ্বাস নেওয়া আর পেট ভরে খাওয়া একই জিনিস নয়। বাজার আগুন। পেট ভরে খাচ্ছে হয়ত শেয়াল-শকুন। তবু আমরা আমাদের স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলাকে খাটো করব না। এর জন্যে বহু ব্যক্তিকে জেলে যেতে ও টরচার সহ্য করতে হয়েছে। কেউ কেউ তো প্রাণও দিয়েছেন। আমরা তাঁদের ত্যাগের ফলভোগী। সুতরাং তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। আমরা কি তাঁদের ভুলতে পারি? নতুন সরকার তাঁদের প্রায় সবাইকেই মুক্তি দিয়েছেন। আমি এমারজেন্সীর বন্দীদের কথাই বলছি। পূর্ববর্তীদের কথা নয়। সে বিষয়ে বিচারকরা যা বলবেন তাই হবে। বিচারকের রায়ই শিরোধার্য হওয়া উচিত। বিনা বিচারে আটক করা অন্যায়। তা বলে বিচারে যাদের শাস্তি হয়েছে তাদের বেলা একই ফরমুলা খাটে না। কংগ্রেস হেরে গেছে বলে ও জনতা পার্টি জিতে গেছে বলে এমন কী হয়েছে যে আইনের শাসন উঠিয়ে দিতে হবে?

শেষ কথা কে বলবে ?

সরকারের বিরুদ্ধে ভোটসংখ্যা বেশী হলে সরকার সরে যায়, এ তত্ত্ব প্রাচীন ভারত বা মধ্যযুগের ভারত জানত না। এরূপ ঘটনা রাজন্যশাসিত ভারতে ঘটেনি। এটা আধুনিক মনেরই ধারণা। এমন কিছু যদি ঘটে থাকে তবে আধুনিক মনের ধারণা অনুসারেই ঘটেছে। আধুনিক মন যদি ঝিমিয়ে থাকে বা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে এমন কিছু হয়তো আর ঘটবে না। সরকার তখন নির্বাচনের ফল দেখে ভদ্রভাবে সরে যাবে না। হয়তো নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হবে না। হলে হবে নির্বাচনের নামে প্রহসন। তা বলে কি সরকার চিরকাল বহাল থাকবে ? না, কেউ না কেউ তাকে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে। নামাবার পদ্ধতিটা অভদ্র। বিপ্লব বা বিদ্রোহ বা সামরিক অভ্যুত্থান যেটাই হোক ঘটবে। কিন্তু তাতে করে প্রমাণ হবে না যে ভোট যার মুলুক তার। বরং আরো একবার প্রমাণ হবে যে জোর যার মুলুক তার।

জোর যার মুলুক তার আমাদের ইতিহাসে অসংখ্যবার প্রমাণ হয়েছে। তার থেকে যদি কেউ ধরে নেন সেটাই একমাত্র সত্য, তাহলে তাঁর সঙ্গে আমি তর্ক করব না। কারণ, আমি জানি যে আধুনিক যুগের ধ্যানধারণা ভারতের লোকের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেনি। যাদের জীবনের পরতে পরতে প্রাগৈতিহাসিক আচার ও সংস্কার তাদের পরণে টেরিলিনের পোশাক দেখে ভ্রম হতে পারে যে তারা অত্যাধুনিক। একজন হয়তো মে'র পার্লামেণ্টারি প্র্যাকটিস মুখস্থ করেছেন। আর একজনের হয়তো কার্ল মার্কসের ডাস ক্যাপিটাল নখদর্পণে। তৃতীয় একজন হয়তো মাও ৎসে-তুং-এর চিন্তা গুলে খেয়েছেন। কিন্তু বাজি রেখে আমি বলতে পারব না যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসি এ দেশে শিকড় গেড়ে বসেছে বা বিপ্লবের পর সোভিয়েট মার্কা

কমিউনিজম প্রতিবিপ্লবের ধাক্কা সামলাতে পারবে বা গণ চীনমার্কা কমিউনিজম মাত্র চারজনের 'গ্যাঙ'কে নিয়ে নাজেহাল হবে না।

বেকারদের কান ধরে কাজে লাগিয়ে দেওয়া ও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ও বছরে একবার লুঙ্গিকোর্তা জোগানো যে কোনো সরকারের পক্ষে সম্ভব। আর গরিবী হটানো বলতে যদি বোঝায় মাসে একশো টাকা রোজগার তাহলে ছাপাখানায় নোট ছাপিয়ে ও ছড়িয়ে সেটাও অসম্ভব নয়। তবে ঐ একশো টাকার ক্রয়শক্তি কমতে কমতে দশটাকার মতো হবে। গরিব তখন যে তিমিরে সে তিমিরে। উৎপাদনের উপর জোর না দিয়ে বণ্টনের উপর জোর দিলে দেশের অন্নভাণ্ডার ও বস্ত্রভাণ্ডার দু'দিনেই শূন্য হবে। যাকে আমরা টাকাপয়সা বলি তার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। ক্রয়শক্তি না থাকলে বা ক্রয়যোগ্য পণ্য না থাকলে ধনকুবেরের সঞ্চিত বিত্তও বৃথা। মুদ্রার ক্রয়শক্তি আর পণ্যের পরিমাণ তথা উৎকর্ষ বাড়াতে হবে। নয়তো সুষ্ঠু বণ্টন কথনোই সম্ভব হবে না। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্তদের কচুকাটা করলেও না। দেশছাড়া করলেও না।

গায়ের জোর আর ভোটের জোর এ দুটোর একটাকে বেছে নিতে হলে আমি বেছে নেব ভোটের জোরকেই। গায়ের জোরে যেসব সমস্যার সমাধান হতে পারে ভোটের জোরেও যে না হতে পারে তা নয়। যারা কখনো ভোটের মুখ দেখেনি, বরাবরই একটা না একটা স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত তাদের স্বভাবতই গায়ের জোরের উপরে পূর্ণ বিশ্বাস। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু দেশের লোক ভোট দেবার অধিকার পেয়েছে ও ভোট দিয়ে সরকারের উত্থান পতন ঘটিয়েছে। তারা যদি পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাতারাতি বরাত ফেরাবার আশায় তার চেয়ে সামরিক একনায়কতন্ত্র বা ফাসিস্ট একনায়কতন্ত্র বা কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র পছন্দ করে তা হলে সেটা দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। কিন্তু পরে একদিন তাদেরও চোখ ফুটবে।

রাশিয়া বা চীন কোন দেশেই ভোটের জোরে সরকার ভাঙা গড়ার রীতি ছিল না। থাকলে সে সব দেশে বিপ্লব ঘটত কি না সন্দেহ। ঘটলে ঘটত গণতন্ত্রীদের দুর্নীতির দরুন। গণতন্ত্রের উপর সর্বক্ষণ পাহারা না রাখলে, চেক ও ব্যালান্স বজায় না থাকলে গণতন্ত্র চরিত্রভ্রষ্ট হতে পারে। শাসকরা শোষক হতে পারেন। এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে ভোট দিয়ে যাঁদের পার্লামেণ্টে পাঠানো গেল তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। তবে গণতন্ত্রের

লম্বা হাত একদিন না একদিন তাঁদের ধরে ফেলবেই। যদি গণতন্ত্রের উপর লোকের আস্থা দৃঢ় থাকে। বিশেষ একটি দলের উপর আস্থা হারানোর পরেও গণতন্ত্রের উপর আস্থা রক্ষা করা সম্ভব। একটা কি দুটো দল আস্থার অযোগ্য বলে গণতন্ত্রকেও আস্থার অযোগ্য সাব্যস্ত করা অন্যায়। যার উপর আস্থা নেই তাকে তাড়াও। কিন্তু গণতন্ত্রকে বাঁচাও। বেঁচে থাকলে সে একদিন শোধরাতে পারে। মরে গেলে তো শোধরাবে না।

ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র একার্থক নয়। অনেক গণতন্ত্রী আছেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রী। আবার অনেক ধনতন্ত্রী আছেন, তাঁরা গণতন্ত্রী নন। গণতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না এটা এখনো অপরীক্ষিত। এ বিষয়ে শেষকথা কে বলবে?

নববর্ষ ভাবনা

আমি রাজনৈতিক লেখায় ক্ষান্তি দিয়েছি। প্রবন্ধ আকারে আপনার জন্যে কিছু লিখতে পারব না। তবে আমি কী ভাবছি তা চিঠির আকারে লিখতে আপত্তি নেই। ইচ্ছা করলে এ চিঠি আপনি প্রকাশ করতে পারেন।

আমার 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত প্রবন্ধটির শেষ অংশ আপনার ভালো লাগেনি। শ্রীনারায়ণ চৌধুরীরও না। এর কারণ বোধ হয় এই যে আপনারা চেয়েছিলেন একটা পটপরিবর্তন। ত্রিশ বছরের কংগ্রেস শাসনের অবসান ও জনতা শাসনের আবাহন। আমি ততদূর যেতে চাইনি। আমি চেয়েছিলুম, আমার তথা আমার মতো হিতৈষীদের হিতোপদেশ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কর্ণগোচর হবে ও তিনি সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে এমার-জেনসী তুলে দেবেন ও সংশোধিত সংবিধানের পুনর্বিবেচনায় রাজি হবেন। দিনের পর দিন আমি প্রত্যাশা করি শুভবুদ্ধির উদ্বোধন। দিনের পর দিন নিরাশ হই। নির্বাচনের দিন আমি ভোট দিতে যাইনি। তাঁর দল যে পরাজিত হয়েছে এটা তাঁরই কর্মফল। তিনিও পরাজিত হয়েছেন এটাও সেই হাইকোর্টের রায়ের উপর জনগণের আস্থাসূচক রায়। যদি কেউ বুদ্ধিজীবীদের হিতোপদেশ না শোনেন তবে জনগণও তাঁর কথা শোনে না। তাঁর দলের কথা শোনে না। এই সত্যটাই এবার বিরাট আকারে প্রমাণিত হলো। বলা যেতে পারে এপিক স্কেলে।

তখনপর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে এমারজেনসীর সিদ্ধান্তটা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একার নয়। সেই সিদ্ধান্ত নেবার আগে নিশ্চয়ই তিনি ক্যাবিনেটের মিটিং ডেকে সকলের মতামত জেনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। অন্ততপক্ষে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত। হতবাক্ হই, যখন শুনি

যে তিনি তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ না করেইএমারজেনসী ঘোষণার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন ও রাষ্ট্রপতি চোখ বুজে সে ঘোষণায় স্বাক্ষর দেন। এটা কি গণতন্ত্রী দেশ না মগের মুলুক? ক্যাবিনেট যখন বসে তার আগেই এমারজেনসী ঘোষণা করা হয়ে গেছে, মোরারজী, জয়প্রকাশ প্রমুখ নেতাদের বন্দী করা হয়ে গেছে, বোধ হয় বিনা ওয়ারেণ্টে। প্রত্যেকদিনই নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে আর আমি দারুণ আঘাত পাচ্ছি। নারায়ণবাবুকে আমি লিখেছিলুম শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু এসব জানাজানির পর আমি আর সেকথা বলতে পারছিনে। আমি চাই যে তিনি অনুশোচনা করুন, প্রায়শ্চিত্ত করুন। ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নয়তো তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

পার্লামেন্টের বাইরে অবস্থিত সংবিধানবহির্ভূত একটা সিণ্ডিকেট প্রধান-মন্ত্রীর উপর হুকুম জারি করবে এটা আমি সমর্থন করিনি। সেইজন্যে আমি ছিলুম ১৯৬৯ সালে তাঁর পক্ষে। পরে দেখা গেল সিণ্ডিকেটের স্থান নিয়েছে ইণ্ডিকেট অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর প্রিয়পাত্র মহল। এঁদের হুকুম মানতে হবে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের। ক্যাবিনেটকে ছাড়িয়ে এঁরাই ক্যাবিনেট। শোনা যায় এঁরাই দিয়েছিলেন এমারজেনসীর কুমন্ত্রণা। সেবারকার সিণ্ডিকেটের মতো এবারকার ইণ্ডিকেটও বনবাসে যাচ্ছে। এদের সঙ্গ ছাড়তে না পারলে বা নারাজ হলে ইন্দিরাকেও বানপ্রস্থ নিতে হবে।

অবশ্য এমন যদি হতো যে বিপ্লব আসন্ন, ক্যাবিনেটের বৈঠক ডাকারও সময় নেই, বিপ্লবীরা তার আগেই লালকেল্লা দখল করতে পারে তা হলে প্রধানমন্ত্রী একাই অত বড়ো একটা সিদ্ধান্ত নিলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। কিন্তু ২৫শে জুন তারিখের রাত্রে তেমন কোনো পরিস্থিতির পূর্বাভাষ ছিল না প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও হবার কথা ২৯শে জুন সকালের আগে নয়। পুরো তিনদিন সময় ছিল ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করার। আমার মনে হয় ক্যাবিনেটের সভ্যরা দ্বিমত হতেন। খবরটা চাউর হয়ে যেত। এমারজেনসী ঘোষণা করার আগেই পাখীরা উড়ে যেত। সম্ভবত এইসব ভেবে প্রধানমন্ত্রী তিনদিন আগে থাকতে বিরোধীপক্ষের উপর চড়াও হওয়া স্থির করেন অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। কিন্তু এমারজেনসী ছাড়া কি অন্য কোনো আয়ুধ ছিল না? বিপ্লব তো নয়। অত ভয় কিসের? তবে কি প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন যে জয়প্রকাশের আহ্বান শুনে মিলিটারি ও পুলিশ সাড়া দেবে?

এমারজেনসী ঘোষণার সাতদিনের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা। আরো মাসখানেক দেখে এমারজেনসীপ্রত্যাহার করলেই হতো। কিন্তু ততদিনে মাথায় অন্য খেয়াল এসেছে। পার্লামেণ্টকে দিয়ে হাইকোর্টের রায়কে অকেজো করিয়ে নিতে হবে। এমারজেনসীর ডাণ্ডা না থাকলে পার্লামেণ্টের সভ্যদেরও ঠাণ্ডা রাখা যাবে না। এমনি করে এমারজেনসীর মেয়াদ বাড়তেই থাকল। সেই সুযোগে অনেক কিছুই হাসিল করা হলো। অবশেষে ব্যাপক আকারে সংবিধান সংশোধন।

ততদিনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অবস্থাটা আক্রান্তের নয়, আক্রমণকারীর। তাঁর কাজগুলো আত্মরক্ষামূলক নয়, আক্রমণমূলক। লোকের সহানুভূতি গোড়ায় তাঁর দিকেই ছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁর বিপক্ষের দিকে চলে যায়। যাঁদের দ্বারা তিনি পরিবৃত থাকতেন তাঁরা তাঁকে সচেতন করেন না। হয়তো তাঁরা নিজেরাই অচেতন। লোকের মনোভাব তো সভা সমিতিতে ও সংবাদপত্রে ব্যক্ত হয়। সভাসমিতি বারণ। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ। প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে জবাব মেলে না। সেসব চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছয় কি না সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তো অসম্ভব।

জনমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছিল সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার বহু পূর্বেই। উচিত ছিল আরো একবছর আগে সাধারণ নির্বাচন করিয়ে নেওয়া। তা হলে পরাজয় এমন সাংঘাতিক হতো না। মোটের উপর কংগ্রেসই জয়ী হতো, যদিও দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক আসন লাভ করত না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময়জ্ঞান নাকি অভ্রান্ত। কিন্তু কার্যত তা নয়। জনমত নীরব বলেই সময় সম্বন্ধে তাঁর ভুল ধারণা জন্মেছিল। মানুষকে জোর করে নীরব করে দিলে পরিশেষে বিভ্রান্ত হতে হয়। নীরব যারা ছিল তারা ব্যালট বক্সের মাধ্যমে সরব হলো। সারা উত্তর ভারত কংগ্রেসবিরোধী, ইন্দিরা বিরোধী। এটা তো একদিনে হয়নি। হতে অন্তত বিশ মাস লেগেছে। কতক লোক এমারজেনসীর আগে থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিল। অধিকাংশ লোক বিমুখ হলো এমারজেনসীর দ্বিতীয় বর্ষে। এমারজেনসীকে তখন নির্বীজকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। অঙ্কুশ চলে গেছে সঞ্জয় গান্ধীর হাতে।

বিনা এমারজেনসীতে সে আর শাসনকার্য চালাতে পারে না। এবার দেখা যাবে জনতা পার্টি কতদিন পারে। জয়প্রকাশ ও মোরারজী এখন পরীক্ষাধীন। ইতিমধ্যেই তাঁরা অপহৃত মৌল অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পুরোপুরি নয়। তার জন্যে আইন করতে হবে। কংগ্রেস যদি সহযোগিতা করে তবেই এটা সুগম হবে। নয়তো দুরূহ। উভয়পক্ষেরই শুভবুদ্ধি প্রার্থনা করি।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি]

সিভিল লিবার্টি ও পলিটিক্যাল লিবার্টি

আপনার চিঠি পেয়েছি। সিভিল লিবার্টিজ কথাটির সংজ্ঞা যদি এতদূর ব্যাপক হয় যে রাজনৈতিক বন্দীদের পলিটিক্যাল লিবার্টিও তার মধ্যে পড়ে তাহলে আপনাদের উচিত ছিল ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান যখন বিধিবদ্ধ হয় ও বিনা বিচারে আটক যখন তার দ্বারা বিধিসম্মত হয় সেই সময়ই সংঘ-বদ্ধভাবে তার বিরোধিতা করা। তারপর থেকে ২৫ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। এতকাল পরে হঠাৎ এই বিরোধিতা কি নীতিগতভাবে বিরোধিতা? তাই যদি হয়ে থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রস্তাবও পাশ করিয়ে নিন যে বিনা বিচারে আটক করার বিধিটাই সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে ও ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলস, মেন্টিনান্স অব ইণ্টারনাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ইত্যাদিও রদ করতে হবে। দেখবেন ততদূর যেতে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বা শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়রাও রাজী নন। তার কারণ তাঁরাও তাঁদেরও আমলে বহু ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করেছিলেন ও আবার করবেন, যদি ক্ষমতা ফিরে পান। নতুবা তাঁরা নিজেরাই আততায়ীর হাতে মরবেন। নীতিগতভাবে আপত্তি যদি তাঁদের থাকে তবে বলবেন আবার সভা ডেকে সেকথা ঘোষণা করতে।

রাজনৈতিক বন্দী বলতে কি কেবল জয়প্রকাশজীর অনুবর্তীদেরই বোঝায়? উগ্র সন্ত্রাসবাদী বা হিংস্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরও বোঝায় না? আপনি কি গ্যারাণ্টি দিতে পারবেন যে আবার কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নাগরিক খুন, পুলিশ খুন হবে না? এদের প্রত্যেকেরই একটা রাজনৈতিক পরিচিতি আছে। প্রত্যেকেই একটা না একটা দলের সদস্য। কেউ নকশাল, অর্থাৎ মার্কসিস্ট

লেনিনিস্ট। কেউ আর এস এস, অর্থাৎ হিন্দুরাষ্ট্রবাদী। নির্বিচারে সবাইকে আটক করা যেমন অন্যায় নির্বিচারে সবাইকে খোলা রাখাও তেমনি বিপজ্জনক। এই ছাব্বিশ বছরে তার প্রমাণ জমতে জমতে পাহাড় হয়েছে। তাই জনমত সরকারকে নিঃশব্দে সমর্থন করেছে। সভা সমিতির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেও সব রকম রাজনৈতিক বন্দীকেই ঢালাওভাবে খালাস দিতে হবে এমনতর দাবী উঠবে না।

সমাজতন্ত্রী দেশে 'ইহাই নিয়ম'। কিন্তু গণতন্ত্রী দেশেও যদি এটাই নিয়ম হয়ে ওঠে তবে জনপ্রতিনিধি বলে যাঁরা পরিচয় দেন ও নির্বাচনে দাঁড়ান তাঁদেরই প্রাথমিক কর্তব্য কতগুলি চেক ও ব্যালেন্সের জন্য দাবী জানানো। তাঁরাই নেবেন এর দায়িত্ব। প্রধানতঃ পার্লামেণ্টে বা বিধানসভায়। এর জন্যে তাঁরা দলাদলি ভুলে একজোট হতে পারেন। সেসব কিছু না করে বা তার দরুন ঝুঁকি না নিয়ে তাঁরাও করতে চাইছেন সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন। এটাও একটা করণীয় কাজ। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস সংরক্ষণ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটস হস্তচ্যুত হবে। যাঁরা রাজনৈতিক বন্দী নন তাঁদের স্বাধীনতাও লোপ পাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌন অধিকার ছিল, লেখনীর স্বাধীনতা ছিল, ভাষণের স্বাধীনতা ছিল। অন্নদাশঙ্কর রায়ের তা নেই। আগে তো স্বাধিকার ও স্বাধীনতা ফিরে পাই। তারপরে বন্দীদের সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখব বা বলব। আমার তিন তিনটে নিবন্ধ এখন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে। কেউ ছাপতে সাহস পাচ্ছে না। একটাই কেবল 'আলেখ্য' ঝুঁকি নিয়ে ছেপেছে। পরে 'জনমহল'। বড়ো বড়ো পত্রিকার স্তম্ভ থেকে আমি নির্বাসিত। আমাকে আমার স্বস্থান ফিরিয়ে দেবার জন্যে কোথাও কোনো দাবী উঠছে কি? সেদিন আমি যদি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু বলতুম তা কোথাও প্রকাশিত হতো কি? আগেকার ভাষণগুলো কোথাও প্রকাশিত হয়নি। শুধু 'স্টেটসম্যানে' কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হয়েছে।

রাজনৈতিক বন্দীরা একদিন না একদিন মুক্ত হবেই। ইতিমধ্যেই বহু-সংখ্যকমুক্ত হয়েছে। এমারজেন্সীও চিরস্থায়ী নয়। ইতিমধ্যেই শিথিল হয়েছে। কিন্তু জুডিসিয়ারির স্বাধীনতা ও প্রেসের স্বাধীনতা যদি সংবিধান সংশোধনের ফলে খর্ব হয় বা ক্ষুণ্ণ হয় বা বরবাদ হয় তাহলে নিকট ভবিষ্যতে তো নয়ই, সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ববৎ হবে না। সুতরাং জোর দিতে হবে এ

স্বাধীনতার উপরেই। শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত যেদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন সেদিন তাঁকে আমি বলেছিলুম যে, আপনারা জুডিসিয়ারির স্বাধীনতা ও প্রেসের স্বাধীনতা এই দুটি প্রসঙ্গেই আপনাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখুন। অর্থাৎ সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের প্ল্যাটফর্ম কেবলমাত্র এই দুটি প্রসঙ্গের জন্যেই সংরক্ষিত হোক। অন্যান্য বিষয়ের জন্যে অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম আছে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বা শ্রীজ্যোতি বসুর কি প্ল্যাটফর্মের অভাব? প্ল্যাটফর্মের অভাব জজদেরই, লেখকদেরই। এঁদেরকে সঙ্গে পেতে হলে এঁদের যেখানে যথার্থ প্রয়োজন সেইখানেই এঁদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। রাজনীতির প্ল্যাটফর্মে সমবেত হলে এঁদের উপর সাধারণ লোকের আস্থা চলে যাবে। কয়েকজন যেমন কংগ্রেসবিরোধী রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত মেলাবেন তেমনি কয়েক-জন মেলাবেন কংগ্রেসপন্থী রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত। জজদের ও লেখকদের বিভক্ত করে নীট লাভ হবে শূন্য। সংশোধিত সংবিধান যেমনকে তেমন থেকে যাবে। জজদের স্বাধীনতা, প্রেসের স্বাধীনতা হবে অতীতের ছায়া। দুদিন বাদে লোকেরও সেটা সয়ে যাবে। কেউ আর টুঁ শব্দটি করবে না।

অশোকবাবুকে যা বলেছি আপনাকেও তাই বলি। রাজবন্দীরা লড়াই করেছেন, জেল তাঁদের সংগ্রামের অঙ্গ। জেলে না গেলেই বরং তাঁরা নিন্দার্হ হতেন। তাঁদের জন্যে চিন্তা না করে আপনি আপনার লেখক বন্ধুদের কথাই একটু ভেবে দেখুন। একখানা কাগজই কি আছে যেখানে তাঁরা মুখের কথা খুলে বলতে পারছেন? যদি থাকে তবে তার অস্তিত্ব বিপন্ন। লেখকরা এরপরে মনের কথা মনে চেপে রেখে মুখে বলবেন অন্যকথা ও সেটাই হবে দেশের সাহিত্য পদবাচ্য। অন্যান্য দেশে এর দৃষ্টান্ত দেখে আপনি কি মুগ্ধ? আমার নিষিদ্ধ লেখাগুলি বই করে বার করে দেবার পর আইন আরো কড়া হয়েছে। এখন সরকার যদি ইচ্ছা করেন ছাপাখানাটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। এরপরে আর কোনো বইয়ের জন্যে প্রকাশক পাওয়া যাবে না। নিজে প্রকাশক হতে চাইলেও আমি ছাপাখানার অভাবে বই বার করতে পারব না। এখন সংবিধানের নবম তফশীলে এসব বিধিনিষেধ আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে তুলে রাখা হয়েছে। এর প্রতিকার যদি অভিপ্রেত হয় তবে সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নকে রাজনীতিকদের প্ল্যাটফর্ম না করাই শ্রেয়। তাঁদের লড়াই তাঁরা অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে করুন। আমাদের যেটা লড়াই সেটা রাজনীতি-বর্জিত ও দলনিরপেক্ষ। নয়তো আমরাই দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যাব। তার

লক্ষণও দেখছি। একই দিনে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেখা গেল সরকার পক্ষের আহূত সভায়।

আমাকে আমার ইমেজ রক্ষা করতেই হবে। এটা শুধু আমার পক্ষেই নয়, আমার দিকে যাঁরা তাকিয়ে রয়েছেন তাঁদের পক্ষেও জরুরি। একজন মানুষ তার লেখনীর সাহায্যে যতদূর যেতে পারে ততদূর আমি যাব। তার চেয়ে বেশি দূর যাওয়া আমার সাধ্য নয়। আমার লেখনীই আমার অস্ত্র। বক্তৃতা আমার অস্ত্র নয়। পুস্তক ও পত্রিকাই আমার বাহন। সভা সমিতি আমার বাহন নয়। তবে পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হলে এরও প্রয়োজন আছে। বিশেষত বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। যখন পুস্তক আর পত্রিকাও আমার বাহন হতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে আমি বিশেষ কোনো শিবিরভুক্ত হতে রাজী হব না। আমার কথায় কাজ হলে আমি অশোকবাবুর সঙ্গে সহযোগিতা করব। তা তো হচ্ছে না।

একদা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ আমাকে সিটিজেনস ফর ডেমোক্রাসীর কলকাতা শাখার সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। আমি রাজী হই নি। সুতরাং এই যে ইউনিয়নের সভাপতি হতে নারাজ হওয়া এটা নতুন কিছু নয়। এক এক করে সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সভাপতিত্ব থেকেও আমি বিদায় নিচ্ছি। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর সাম্প্রদায়িক মৈত্রী পরিষদেরও আমি সভাপতি ছিলুম। এখনো আছি কিনা জানি নে। থাকতে আর ইচ্ছে নেই। বাংলা সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি মণ্ডলী থেকেও আমি অপসরণ করার অভিপ্রায় শ্রীবিনয় সরকারকে ও শ্রীমনোজ বসুকে জানিয়েছি। শেষপর্যন্ত পি ই এনই আমার একমাত্র ঠাঁই হবে। ভারতের পি ই এন কেন্দ্রের আমি অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট। পশ্চিমবঙ্গের পি ই এনের আমি চেয়ারম্যান। প্রি-সেনসরশিপের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পি ই এন প্রতিবাদ করেছিল।

আপনি শ্রীসতীকান্ত গুহর কথা কেন তুলেছেন জানি নে। আমার কন্যা তাঁর স্কুল থেকে পদত্যাগ করে কটকের মহিলা কলেজে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছে। সতীকান্তবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই সাহিত্যিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। তিনি বিপদে পড়েছেন বলে আমি তাঁকে ত্যাগ করব এতখানি নির্মম আমি নই। তাঁর অপরাধ

বিচারের ভার আমার উপরে নয়, কোর্টের উপরে। আর তাঁর সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচারের ভার দেশের বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর উপরে। বিচারের কাল উত্তীর্ণ হয়নি।

সেমিনার সম্বন্ধে এখনো মনঃস্থির করিনি। রাজনীতির ছোঁয়াচ আছে জানতে পেলে ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলব। এটা আমার চিরকালের নীতি। বহু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছি। বহু ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনিও যদি হন তবে আমি নিরুপায়।

[শ্রীনারায়ণ চৌধুরীকে লিখিত পত্র]

পরিশিষ্ট

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব প্রসঙ্গে

এক কথায় সংবিধান-রচয়িতাদের মনে ছিল পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের একটা স্বরূপ, যার ইতিহাসের উৎস ম্যাগনা কার্টা। এটা ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনায় একটা অমূল, অনাত্মীয় ধারা। জার্মানীর মতো একদিন না একদিন এর বিপর্যয় অনিবার্য ছিল। বর্তমানে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র কাজ করতে পারছে না জরুরী অবস্থা এবং তৎপরবর্তী সংবিধানের আমূল সংশোধন ছাড়া, খেলার নিয়মকানুন চেনা যায় না এমনভাবে না বদল করে। এ পটভূমিতে কালের গতিতে ব্রিটেনের মতো একটা দু-দলীয় ব্যবস্থা উদ্ভূত হবার কোন অবকাশ নেই। যে কোন সংখ্যায় বিচ্ছিন্ন দলগুলি পার্লামেণ্টে স্থান নিতে পারেন, কিন্তু একত্রিত হলেও কোনদিন তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবেন না, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার কথা ত ওঠেই না। স্বভাবতই তাঁরা চাইবেন একটা পার্লামেণ্ট বহির্ভূত খেলা খেলতে। কিন্তু খেলার নয়া কানুনে তাঁরা তা করতে বাধা পাবেন।

একটা বৃহৎ পরিমাণ জাতীয় প্রয়াস নষ্ট হবে বেড়াল-ইঁদুর খেলায়। লোককে জেলে পোরা, তাঁদের ছাড়া, আবার তাঁদের ধরায়। এরকম ব্যবস্থায় কোন রকম অন্তরপরিবর্তন সম্ভব নয়। শত্রুরা বরাবরই শত্রু থেকে যাবেন। অস্থির উত্তেজনায় তাঁরা উত্তরোত্তর হিংস্র হয়ে উঠবেন। উভয়পক্ষই উত্তরোত্তর বেশি মিথ্যা বলবেন। মিথ্যা আর হিংসা একই মুদ্রার দুই উল্টো দিক।

এইখানে আমরা নাগরিকরা এসে পড়ি। আমরা অনুমতি পাব না সত্যকে জানতে। সমস্ত বই, পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদপত্র প্রি-সেন্সরশিপ ব্যবস্থায় ন্যস্ত হবে। কিছু সম্পূর্ণত আটকানো হবে৷ যদি আমাদের মধ্যে কেউ

লেখক হন, তাঁকে তাঁর লেখা প্রকাশের আগে সেন্সরের কাছে পাঠাতে হবে। শেষ পরিণাম হবে একটা মন-গড়া বিশ্বাসের জগৎ। জনসাধারণ সহজেই মেনে নেবেন সবরকম গুজব। মোহভঙ্গের পর তাঁরা সব কিছুই অবিশ্বাস করবেন রটনা বলে। যখন সত্যও বলা হবে তখন তাঁরা তা বাতিল করবেন মিথ্যা বলে। লেখকরা দেখবেন তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা আর নেই।

সংবিধান সংশোধনের পরিণামে নিশ্চয়ই কিছু সুফল পাওয়া যাবে। কিছু ভালো আইন, কম শোষণ এবং বেশি চাকরির মাধ্যমে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে পার্লামেণ্টের হাতেই পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের ইতি হবে। কেননা একে আপনি পার্লামেণ্ট বলতে পারেন না, যদি এর নাক ধরে একে টেনে নিয়ে যান এমন কয়েকজন নেতা যাঁরা সব সমালোচনার উর্ধ্বে। এটা একটা রাজ দরবার।

[ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে 'সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব' বিষয়ক এক সভায় পঠিত লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধের বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।]